ফেব্রুয়ারী সংখ্যা

মাসিক

সত্য প্রকাশ

ইসলামকে পূর্নভাবে জানাতে
আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী.....

আল কুরআনের তাফসীর
সূরা বাকারাঃ ১ম রুকু

আলহাজ্ব হযরত মাওঃ শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ
পীর সাহেব হুজুর, দুধল দরবার শরীফ।
(দুধল দরবার শরীফের বাৎসরিক তালিমী জলসা থেকে সংগৃহীত)

আলিফ লাম মিম। সূরা বাকারার শুরু, হরফে মুকাত্তায়াত বলা হয়। ইহার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেহই জানেনা। ইহার অর্থ একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন। যেই জিনিসের অর্থ কেহই বলিতে পারিবে না, সেই জিনিসটা দিয়ে লাভ কি? আপনারা জানেন যে, আল্লাহ তায়ালা অহংকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাইলের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলিয়াছেন।

অর্থাৎ– এবং তুমি জমীনের উপর দিয়া গর্বসহকারে চলিওনা। চলিলে চলিতে পার কিন্তু স্থান হবে জাহান্নাম।

অহংকার আসে সাত কারণে. এর মধ্যে প্রথমই হইলো ইলেম। ইলেমের কারণে অহংকার আসে। আর কুরআন হইলো ইলেমে বোঝাই। আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি করেন এবং কুদরতি কলম সৃষ্টি করেন। কুদরতি কলমকে আল্লাহ বলিলেন যে, হে কুদরতি কলম তুমি লিখ আমি যা মনস্থ করতেছি। বিনা লেখকে লিখতে থাক। কলম ---------- থেকে শুরু করিয়া একদম একশত চারখানা কিতাব যখন লিখা শেষ করিল, আল্লাহ বলিলেন বাস থাম। তাহা হইলে একশত চারখানা কিতাব কার রচিত? আল্লাহর। তাহার ভিতরে চারখানা কিতাবের নাম সবারই জানা–যথা–তওরাত, যবুর, ইনজিল ও কুরআন মাজীদ। তাওরাত কিতাব নাযিল হইয়াছে হযরত মুছা (আ:) এর উপর, যবুর হযরত দাউদ (আ:), ইনজিল হযরত ঈসা (আ:) এবং ফুরকানে হামিদ তথা কুরআনে মাজীদ আমাদের নবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর উপর নাযিল হইয়াছে। যে যুগের জন্য যে কিতাব, ঐ কিতাব মানা এবং কিতাবের শিক্ষক মানা ফরয। নবী পয়গম্বর ছিলেন শিক্ষক। একশত চারখানা আসমানী কিতাব। নবীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে, ২ লক্ষ ২৪ হাজার। বিশ্ব নবীর পরে কোন নবী–রাসূল আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের আইন–বিধানগুলো জারি করবেন কারা? হক্কানী আলেম, যেমন রসূল (স:) বলেন– ---------- – অর্থাৎ– আলেমগণ নবী–রাসূলগণের উত্তরাধিকারী এখন মোরগ বা হাসের জন্য ভেকসিন দেয় আগে, রোগ হইয়া গেলে ভেকসিনে ধরে না। তাহা হইলে কতগুলি রোগ আছে যাহার আগে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা না হইলে কুরআন পড়িলেতো ছিনা মোটা হইয়া যাইবে, যে আমি কত কিছু জানি। কিন্তু যখন ----- হরফে মুকাত্তায়াত পাঠ করা হইল তখন বলিতে হইল আমি জানিনা। জানে কে? আল্লাহ। আবার মাঝে মাঝে এরকম ---------- ইয়াসিন, হা মিম, ত্ব হা ইত্যাদি হুরুফে মুকত্তায়াত কুরআনের ভিতরে আসবে। যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ ভাল জানেন। ---------- ---------- অর্থাৎ– এটা ঐ কিতাব যাহার ভিতরে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কিতাব? যে কিতাব আল্লাহর কুদরাতি কলমে রচিত, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। যে কিতাবের বাশারাত অন্যান্য নবীরা দিয়েছেন। ঐ কিতাবে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ রচনাকারী কে? আল্লাহ নিজেই।

---------- অর্থাৎ– এই কিতাব মুত্তাকীনদের হেদায়াত দান করিবে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন–---------- অর্থাৎ– (কুরআন) মানুষের হেদায়াতের জন্য। হেদায়াতা অর্থ রাস্তা দেখানো, পথ দেখানো। হেদায়াতের দুই অর্থ– এক অর্থ হইলো–রাস্তা দেখানো, আর অপরটি হইলো রাস্তা দেখিয়ে একেবারে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

যেমনঃ– একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বরিশাল যাইব কোন দিক থেকে? আপনি হাত দ্বারা ইশারা দিয়ে বলিলেন যে, এই দিক দিয়ে। আর একজন আসছে সেও বরিশাল অন্য এক যায়গায় যাইবে। এখন দেখিল যে একে একা ছাড়া যায় না। (এতো আমার ঘনিষ্ট কিন্তু সে) আমার পরিচয় পায় নাই। তখন আপনি বাতির ব্যবস্থা করেন, এরপর তাহার মালামাল সহ একদম সে বরিশালে যে বাসায় যাইবে সেই বাসা পর্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহা হইলে এটাতো পথ দেখানো।

আর যারে বলে দিয়েছেন যে, এদিক দিয়ে যান? কুরআন মুত্তাকীনদের জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইবে। ---------- মুত্তাকীন হইতে গেলে তিনটি বন্দেগী লাগে– রূহানী বন্দেগী জেসমানী বন্দেগী, মালী বন্দেগী ----------অর্থাৎ–নামাজ কায়েম করে, আমি তাহাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা আল্লাহর বিধানমত খরচ করে। এখানে রোযার কথা নেই, হজ্জের কথা নেই, পিতা–মাতার হকের কথা নেই। কিন্তু ইশারা দেওয়া হয়েছে। উদাহরণত আ লিখে দুটি শূন্য দিয়ে দেয়, যেমন "আঃ" (আব্দুল) এভাবে করে কিনা? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম না লিখে 'মুঃ" (দঃ) অর্থ দরূদ পড় (সঃ) অর্থাৎ– সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাতো মানুষের অভ্যাস। তাই, আল্লাহ তায়ালা জিসমানী বন্দেগীকে নামাজের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। আর জিসমানী বন্দেগীর প্রধান হচ্ছে নামায।

উদাহরণত বাড়ি একশ জনের কিন্তু সেটা এক নামে সকলে চিনে। তা হইলে সালাত কয়বার আসে দৈনিক? পাঁচ বার। শুধু নামায পড়িলেই হইবে? রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত ও করিতে হইবে।

আর আল্লাহ যে মাল দিয়েছেন তা আল্লাহর বিধানমত দান করিতে হইবে। এটাকে বলা হয় মালী বন্দেগী। তাই–আত্মা দ্বারা যা বিশ্বাস করিতে হয়, আত্মা দ্বারা যা একীন করিতে হয়, আত্মা দ্বারা অনেক কিছু আল্লাহর হুকুম পালন করিতে হয়। আবার যা নিষেধ করা হইয়াছে তাহা থেকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে আত্মার বন্দেগীর নাম কী? রূহানী বন্দেগী। দেহের বন্দেগীর নাম কী? জিসমানী বন্দেগী। মালের বন্দেগীর নাম কী? মালী বন্দেগী তাহা হইলে একজন মুসলমান। যে তিন ও বন্দেগী আদায় করে সে সেফাতী মু'মীন।

আর একজন মুসলমান হইলো মুসলমান কিন্তু মু'মীনের কোন সিফাত তাহার মধ্যে যদি না পাওয়া যায় তবে সে জাত মু'মীন। যেমন একজন ব্যক্তি কালিমায় বিশ্বাসী কিন্তু ৫০ বছর বয়স হইছে পশ্চিম দিকে ফিরে একটু নামাযও পরে না। এটা কি হইল? জাত মুসলমান। গরু জবেহ করিয়া দাওয়াত দিলে যায় কিন্তু যদি বলে তোর জন্য একটা শুয়ার জবেহ দিব তবে রাগ হইয়া উঠে। আমি কি মুসলমান না? নামায পড়ি না তাহাতে কি হইয়াছে? পড়িব কিছুদিন পর। দাবি করে মুসলমান আসলে সিফাত অর্জন করে নাই, (তাই) জাত মুসলমান।

উদাহরণত একটা বাড়ি উকিল বাড়ি। এখন উকিল বাড়ির ভিতরে ধনী থাকে গরীবও থাকে। একটা অশিক্ষিত লোক খুব কথা–বার্তা জানে। যদি যাইয়া কোর্টে উঠে যে, আমি ওকলাতি করি, এখন জিজ্ঞাসা করে তোমার ওকলাতির সার্টিফিকেট আছে? হ্যাঁ ওকলাতির সার্টিফিকেট আছে। যা এই উকিলদের কাহারো নেই। (প্রশ্ন–কি) দলীলে লেখা আমি অমুক উকিল, আমার বাবার নাম অমুক উকিল, দাদার নাম অমুক উকিল, ভাইয়ের নাম অমুক উকিল। আপনি জমি করিয়াছেন তাও উকিল নামে করিয়াছেন। প্রশ্ন করিল– আপনি লেখা–পড়া করিয়াছেন কি? বলিল–এই দিক দিয়ে তো বোকা। চতুর্থ শ্রেণিতে উঠছিলাম। এখন তাহাকে কি ওকলাতি করিতে দিবে? তা হইলে মুসলমান সত্য কিন্তু নামায, রোযা, রূহানী বন্দেগী, জিসমানী বন্দেগী, মালী বন্দেগী কোন বন্দেগী করে না। তাহাকে বেহেস্তে ঢুকিতে দিবে? দিবে না। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি আমার বন্দেগী করনাই কেন? আর একভাগ মানুষ আছে– যাহারা কাফের। এরা বুঝে শুনে কাফের। যেমন আবু লাহাব, আবু জাহেল, ওদবা–শায়েবা এরা বুঝে শুনে কাফের। যত বুঝাও এরা বুঝিবে না। এরা জানত রাসূল সত্য তবুও তাহারা বিশ্বাস করে নাই। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। আর একভাগ আছে যাহারা বিশ্বাস করে মুখে। ----------অর্থাৎ যাহারা মুখে বিশ্বাস করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেনা এরা মোনাফেক। আল্লাহ কাফের হইতেও নিষেধ করেছেন এবং মোনাফেক হইতেও নিষেধ করেছেন। মোমেন হইতে বলেছেন, জাত মুসলমান থাকিতে নিষেধ করিয়াছেন। মৃত্যুর আগে ঠিক হইয়া যাও– যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–---------- অর্থাৎ হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সঠিকভাবে ভয় কর এবং তোমরা পূর্ণ মুসলমান না হইয়া (অর্থাৎ আকাইদ, তাছাওউফ ফিক্বাহ শিক্ষা না করিয়া) মরিয়া যাইওনা। পুরোপুরি মুসলমান না হইয়া মৃত্যু বরণ করিও না। পূর্ণ মুসলমান না হইলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

"পৃথিবীর মানুষ কয়ভাগ? তিনভাগ– (১) মোমেন (২) মোনাফেক (৩) কাফের। শুভ সংবাদ একভাগের জন্য সেই ভাগ হচ্ছে মু'মীন। আবার মোমেন ২ ভাগ। (১) সেফাতী মোমেন (২) জাত

মোমেন জাত মোমেনের জন্য অবকাশ আছে যে মৃত্যুর আগে মোমেনের ছেফাত অর্জন কর । মোমেনের ছিফাতগুলো অর্জন করিলে নাজাত পাইবে। তাহা না হইলে জাহান্নাম ভোগ করিতে হইবে।

আল্লাহ কয়জন? একজন, আসমান জমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? আল্লাহ। যিনি সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা কে? আল্লাহ। কিন্তু আগে অনেক সময় নাস্তিকের কবলে পড়িতে হইত।

(ইমাম আজমের সময়ে) এক জমিদার ছিল খুব অত্যাচার করিত। সে আলেমদের দাওয়াত দিয়ে এবং প্রত্যেককে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করিত এবং তাহাকে অপদস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিত। ইমাম আবু হানীফা, তখন সে ছাত্র ছিল। তাহার ওস্তাদের কাছে জমিদার পক্ষ থেকে একজন লোক আসিল যে (একজন ব্যক্তি) আল্লাহ সম্পর্কে বহাছ করিবে। আপনাদের একজন চাইছে। ইমাম আবু হানিফার শিক্ষক বলিলেন কে? লোকটি বলল অমুক জমিদার। তো ওস্তাদ বলিলেন যাওয়ার দরকার নেই। ও কোনো আলেমের সম্মান রাখে না। ইমাম আবু হানিফা বলল হুজুর আমি যাইতে চাই। হুজুর বলিলেন তুমি যাইবে তোমারতো সম্মান রাখিবে না। ইমাম আবু হানিফা বলিলেন আমারতো সম্মান তৈরিই হয়নি। আমি ছাত্র। সম্মান তৈরি হইলে না নষ্ট হইবে। তাঁহার হুজুর বলিলেন ঠিক আছে। যাও তাহা হইলে। তিনি (ইমাম আবু হানিফা) চলে গেলেন। যাওয়ার পরে দেখিতেছেন সে (জমিদার) চেয়ারে বসা। এমনি তাহাকে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফাকে বলিল দাড়িয়ে উত্তর দাও। তখন ইমাম আবু হানিফা বলিলেন ঠিক আছে। আমি যে আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিব কোন হিসেবে? আমার সাথে বাহাছ করিবেন না আমি আলেম হিসেবে কিছু জানিয়া নিবেন? আলেম হিসেবে জেনে নিতে পারেন আর বাহাছ করিলেও করিতে পারেন। কোনটা করিবেন? এখন (জমিদার) দেখে যে বহাছের কথা বলিলে উভয়কে সমান চেয়ার দিতে হইবে। তাহা না হইলেতা বহাছ হয় না। জমিদার বলিল তোমরা আলেম মানুষ তোমাদের থেকে কিছু জানিতে চাই। ইমাম বলিলেন আপনি জানিবেন আর আমি জানাবো তাহা হইলে আমিই হব শিক্ষক। আপনি হইবেন ছাত্র। জমিদার বলিল–যা মনে কর। ইমাম আবু হানিফা বলিলেন তাহা হইলে চেয়ারটা আমাকে দিন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষক উত্তর দিবে, আর ছাত্র চেয়ারে বসা থাকিবে। এমন ছাত্র কেউ পড়ায় না। কাজেই আপনি চেয়ার আমাকে দিন। এখন (জমিদার) কথায় ঠেকে পড়িয়াছেন। জমিদার বলিল আস, বস। এখন (জমিদার) বসিয়াছে তাহার (আবু হানিফা (রহঃ) সামনে। এখন জমিদার জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কয়জন? ইমাম আবু হানিফা উত্তর দিল একজন। জমিদার বলিল আল্লাহ যে একজন তা প্রমাণ কর। ইমাম আবু হানিফা একটি তসবীহ পকেট থেকে উঠিয়ে দিয়ে বলিল যে, আপনি গোনা জানেন কিনা আমার বুঝিতে হইবে আপনি গুনেএ জমিদার এক থেকে একশত পর্যন্ত গুনিল ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলিল, বেশ এখন পিছনের দিকে গুনেন। পারবেন কিনা? জমিদার ১০০, ৯৯ এভাবে গুণিতে গুণিতে ১ পর্যন্ত আসছে। ইমাম আবু হানিফা প্রশ্ন করিলেন ১ এর আগে কি? জমিদার বলিল ১ এর আগে কিছু নাই ইমাম আবু হানিফা বলিলেন আল্লাহ তো এক আল্লাহর আগেও কিছু নেই। জমিদার বলিল আচ্ছা তোমার আল্লাহ এক। সে কোন দিকে চেয়ে আছেন? তখন বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। তখন জমিদার বাড়ি বড় মোমবাতি জ্বালাত। তো টেবিলের উপর মোমবাতি জ্বালানো ছিল। ইমাম আবু হানিফা বলিল এ মোমবাতির আলো কোন দিকে চেয়ে আছে? জমিদার বলিল– মোমবাতির আলো তো সবদিকে চেয়ে আছে। ইমাম আবু হানিফা বলিল আল্লাহও সব দিকে চেয়ে আছেন। অনেক প্রশ্নের পর শেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আল্লাহ এখন করে কী? ইমাম আবু হানিফা বলিলেন–আমার আল্লাহ এখন কী কাজ করে তা আপনি দেখেন না? আপনি ছিলেন চেয়ারে আপনাকে বসাইছে নিচে। আমি ছিলাম নিচে আমাকে বসাইছে চেয়ারে। আপনাকে ঠকায় আমাকে জিতায়। এইতো করে কাজ। তাহা হইলে আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ সর্বশক্তিমান কালিমাহ।

ঈমানে মুফাস্সাল–

অর্থাৎ– সাত জিনিসের প্রতি ঈমাম আনিতে হয়। (১) আল্লাহর উপর (২) ফেরেশতার উপর (৩) কিতাবের উপর (৪) রাসূলের উপর (৫) কিয়ামত দিবসের প্রতি (৬) তাকদীরের প্রতি (৭) মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রতি। তাহা হইলে কিতাবের উপর বিশ্বাসের অর্থ হইলো কিতাবে যেই মাসআলা যেইভাবে লেখা আছে সেইভাবে বিশ্বাস করা।

(দুধল দরবার শরীফের বাৎসরিক তালিমী জলসা থেকে সংগৃহীত)

বেপর্দার কুফল

আলহাজ্ব হযরত মাওঃ শাহ মোঃ আঃ ওয়াহিদ
পীর সাহেব হুজুর, দুধল দরবার শরীফ।

বর্তমানে বাংলাদেশ মুসলমান সরকার দ্বারা পরিচালিত অথচ সরকার কর্তৃক মহিলাদের দ্বারা সম অধিকারের নামে বেপর্দাভাবে চাকুরি করানোর ব্যবস্থা ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে। শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরি মহিলাদের দ্বারা করানোর দৃঢ় ব্যবস্থা হইতেছে। মনে করা হইতেছে। ইহাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইবেনা। আমি বলিতে চাহি। ইহাতে রাষ্ট্রের সমস্যা আরো বাড়িয়া চলিতেছে। আস্তে আস্তে দেশ ধ্বংসের লিলা ভূমিতে পরিণত হইবে। আমার কথার যুক্তি ও দলীল নিম্নে কিয়দাংশ তুলিয়া ধরিতেছি।

বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলিম। এদেশের মহিলারা পুরুষের অধীনে থাকিয়া জীবন–যাপন করিতে পারিলে বেশ সন্তুষ্ট। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ কর্মসংস্থান সরকারের হাতে থাকায় আজ লক্ষ লক্ষ পুরুষ এস.এস.সি/এইচ.এস.সি/ অনার্স/মাস্টার্স/কামিল/দাওরা পাশ ছেলেরা পর্যন্ত বেকারত্তে ভুগিতেছে।

মহিলাদের যতই চাকুরী হোক তাহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিত পুরুষ বেকারত্বে ভুগিয়া কিছুতেই সন্তুষ্টি থাকিতে পারিতেছেনা।

বরং পুরুষদের চাকুরি হইলে যে কয় লক্ষ মহিলাদের চাকুরি হইতেছে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। কারণ এমন মানুষিকতা এখনও শতকরা ৯৯জন মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান।

তদুপরি যতই মহিলাদের চাকুরির হার বাড়িতেছে পুরুষ যুবকগণের বেকার সমস্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বেকার পুরুষদের রেশানালে সরকার ততই বিব্রত হইতে বাধ্য।

যতই মহিলাদের চাকুরী বাড়িতেছে ততই শিক্ষিত পুরুষ যুবকগণ বেকার হওয়ার কারণে তাহারা হাইজ্যাক /লুণ্ঠন ডাকাতীর পেশা বাছিয়া নিতেছে। কারণ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লেখাপড়া করিয়া আই.এ/বি.এ পাশ করিয়াও যখন ভাল চাকুরি পায়না তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া অনেকেই খারাপ পথ বাছিয়া নিবে ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারেনা।

তদুপরি লক্ষ্য করা যায় যে সংসারে স্বামী চাকুরি করে সেই সংসারে স্ত্রী ও চাকুরি করে এমনিভাবে একই সংসারে ডাবল চাকুরি আর ডাবল পয়সা অপর সংসার গুলোতে স্বামী স্ত্রী উভয় বেকার থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে ধনী আরো ধনী হইতেছে, গরীব আরো গরীব হইতেছে।

যেই উচ্চ শিক্ষিত স্বামী স্ত্রী উভয় চাকুরি করিতেছে তাহাদের ছোট ছোট সন্তানদের চাকর চাকরাণীর দ্বারা লালন পালন করিতে হইতেছে ইহাতে মায়ের দুধের পরিবর্তে অধিকাংশ সময় ভেজাল দুধ খাওয়ানো হইতেছে এবং চাকরদের অশুদ্ধ ভাষা ও অভদ্র আচরণে বাচ্চারা অভ্যস্ত হইতেছে।

পিতামাতার ভদ্রতা, নম্রতা ও সুআচরণ, শুদ্ধ ভাষা এবং মায়ের স্নেহ হইতে তাহাদের শিশু সন্তানেরা বঞ্চিত হইয়া নিচু জাতের কুস্বভাবে অভ্যস্ত হইয়া স্বকীয় বৈশিষ্টতা হারাইতেছে।

বেপর্দাভাবে পুরুষ মহিলাদের চাকুরির কারণে আপন স্বামীর ভালবাসা বিসর্জন দিয়া বহুনারী সম সাথী অর্থাৎ অফিসে একত্রে চাকুরী করে এমত লোকদের সাথে হৃদয় দেওয়া নেওয়া করিতেছে। বহু সোনার সংসার স্বামী স্ত্রীর মনের মিল নষ্ট হওয়ায় ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হইয়া সংসার দোযখ খানায় পরিণত হইতেছে।

এই বেপর্দার কারণে বহুক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে ছেলে মেয়েরা বাবার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন রশাতলে যাইতেছে।

বেপর্দার কারণে মহিলাদের ইজ্জত কমিতেছে এবং পুরুষদের কাছে মহিলাদের মূল্য কমিয়া যাইতেছে। তাহার প্রমাণ বিশ্বনবীর আবিভার্বের সময় আরবের অবস্থা জাহিলিয়াত অবস্থায় ছিল।

পুরুষ নারীদের বেপর্দেগী এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ভিন পুরুষ ভিন মহিলার সাথে জেনা করিয়া উহা কবিতায় বর্ণনা করাকে গৌরব মনে করিত।

এই বেপর্দেগীর কারণে মহিলাদের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছিল, যে মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতা মাতা দুঃখবোধ করিত তদুপরি মেয়ে সন্তান হইলে জীবন্ত কবর দিত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল তখন পর্দা প্রথা চালু হইল এবং মহিলাদের মূল্য পুরুষদের কাছে দারুন ভাবে বৃদ্ধি পাইল।

এই বাংলাদেশে সরকারের মাধ্যমে মহিলারা বেপর্দায় চলাফিরা ও চাকুরির সুযোগ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এদেশের মহিলাদের অবস্থা এই ছিল যে, রাস্তা ঘাটে কোথাও পুরুষদের সাথে যদি ভীন মহিলাদের দেখা হইত তখন মহিলারা মাথায় ঘোমটা দিয়া অন্য দিকে ফিরিয়া রাস্তার এক পাশে দাঁড়াইয়া যাইত। পুরুষ দ্রুত হাঁটিয়া যাইত। এমনকি ভরা কলসি সহ কোন মহিলা রাস্তা দিয়া যাইত তখন ভিন পুরুষ রাস্তায় আসিয়া পড়িলে মাথায় ঘোমটা দিয়া রাস্তার এক পার্শে মহিলারা দাঁড়াইয়া যাইত, এমনকি পুরুষ বসার ঢং দেখবে এই আশংকায় কলসটি পর্যন্ত জমিনে রাখিত না এবং নিজেও বসিতনা।

আর পুরুষ মহিলাদের মনে যতদিন পর্দার প্রবণতা এতটুকু ছিল তত দিন পর্যন্ত বাংলার মুসলিম মহিলাদের মূল্য পুরুষদের চোখে অনেক বেশী ছিল। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় তখন বাংলার মহিলাদের বিবাহের সময় পন ছিল অর্থাৎ মেয়ের বাবাকে বিবাহের খরচ বাবদ টাকা দিতে হইত আর ইহাকে পন নামে আখ্যায়িত করিত। তখন পিতামাতা মেয়ে সন্তান হইলে খুব খুশি হইত কারণ এভাবে কয়েকটা মেয়ে সন্তান বিবাহ দিতে পারিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইত। তখন আলেম সমাজের ওয়াজ নসীহতেও পন প্রথা বাতিল হইছিলনা। কিন্তু যখন থেকে বেপর্দা বেহায়ামী পুরুষদের সাথে মহিলাদের সহচাকুরী সহ শিক্ষার প্রবণতা বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজ হইতে পর্দার মন মানুষিকতা দূরিভূত হইয়া গিয়াছে তখন হইতে মহিলাদের মূল্য এত হ্রাস পাইয়াছে যে, হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও যৌতুক প্রথা চালু হইয়া গিয়াছে। আর এখন কন্যা সন্তান হইলে পিতা–মাতা অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

একটি গল্প আছে দুই ব্যক্তি কলা বিক্রির জন্য বাড়ি থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলো। একজন ছিল বুদ্ধিমান অন্যজন একটু বোকা। বোকা ব্যক্তি ভাল একছড়া কলা উহার কলাগুলি ছুলিয়া ফেলিল। কলার উপরের আবরণ বা পর্দা খশাইয়া ফেলিয়া দিয়া সেই আবরণ বিহীন কলাগুলো একটি উন্মুক্ত পাত্রে করিয়া বাজারে নিয়া গেল। উদ্দেশ্য ছিল মানুষতো খাবার সময় ছোলা ছুলিয়া খাইবে তাই আবরণ তারা কষ্ট করিয়া খুলিবে কেন? চিন্তা করিল আবরণ ফালাইয়া বাজারে নিলে বিক্রি ভালো হইবে। দেখা গেল আবরণ উন্মুক্ত করার কারণে কলাগুলিতে মাছি পড়িতে লাগিল যে কারণে বিক্রি ভালো হওয়া তো দূরের কথা কলা বিক্রি করাই দুঃসাধ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আর অন্য বক্তি কলার আবরণসহ নিয়া গেল তাহার কলা অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রি হইয়া গেল। কিন্তু বোকা ব্যক্তির কলার আবরণ ফালাইয়া দেওয়ায় মাছি পড়ার কারণে মানুষ কিনিতে ছিলনা। ঠিক এই ভাবেই মহান রব্বুল আলামীন মহিলাদের উপর পর্দার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে নারীদের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

আর বের্পদা বেহায়া মেয়েদের মূল্য পুরুষ সমাজের কাছে খুবই কম। কাজেই, বেপর্দা ও সহ–চাকুরিতে মেয়েদের সম্মান ও মূল্য বাড়িতেছেনা বরং দিন দিন কমিতেছে।

পুরুষদের কাজগুলো মহিলাদের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদেরকে বুঝানো হইতেছে যে আগে ঠকানো হইতেছিল বর্তমানে ঠকানো হইতে বাঁচানো হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে মহিলাদেরকে আরো ঠকানো হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর বিধান হইল পুরুষগণ রোজগার করে মহিলাদেরকে খানা পিনা–পোষাক থাকার ঘর ইত্যাদি সবই দিবে। এমনকি পুরুষগণ কামাই করিয়া যা খাইবে পরিবে তাহাই মহিলাদেরকে খাওয়াইবে পরাইবে। আর মহিলারা গর্ভে সন্তান ধারণ করিবে দুগ্ধ পান করাইবে গৃহিণীর কাজগুলো আনজাম দিবে।

বর্তমানে পুরুষের কাজ মহিলাদেরকে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে এমনি খাল কাটার কাজ পর্যন্ত মহিলাদের করিতে হইতেছে। অথচ সন্তান গর্ভে ধারণের যে কষ্ট মহিলারা ভোগ করিতেছে পুরুষ তাহার অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ মাস পাঁচ দিন গর্ভে ধারণ করা উচিত অথচ উহা পুরুষ করিতেছেনা এবং পুরুষের ঐ শক্তি নাই। মাতা দুই বৎসর সন্তানকে দুগ্ধ পান করার দায়িত্ব রাখে। পুরুষের চাকুরি

মহিলাদের দ্বারা করালে পুরুষ নিজ স্তন হইতে দুই এর অর্ধেক। অর্থাৎ এক বৎসর দুধ পান করাইতেছেনা আর এই ক্ষমতা পুরুষের নাই। সন্তানের পায়খানা প্রসাব থেকে শুরু করে গৃহিণীর সমস্ত কাজ অদ্য পর্যন্ত মহিলাদেরই করিতে হইতেছে। পুরুষতো উহা থেকে অর্ধেক করিতেছেনা। তবে পুরুষের চাকুরির রোজগারের দায় দ্বায়িত্ব মহিলাদের দ্বারা করানো হইতেছে। ইহাতে মহিলাদেরকি ঠকানো হইছেনা ইহার নাম কি সমান অধিকার?

যুবক যুবতি গনের বেপর্দাভাবে সহ শিক্ষা চালুর কারণে বহু মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী প্রেম জনিত রোগে তাহাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছে। তাহাদের লেখা পড়ায় ভাটা লাগিয়া যাইতেছে আর পুরুষ যুবক অবৈধ ভাবে যুবতীদের সাথে মন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে উজ্জল ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া বসে, ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। যথা– কথিত আছে মুসলিম কবি কাজী নজরুল রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে নাম করিয়া ফেলিবেন আর কিছুদিন তার খুব ধার লেখনী চালাইতে পারিলে বিশ্ব কবির খ্যাতি ভবিষ্যতে কবি নজরুল পাইয়া বসিবেন এই সম্ভাবনা যখন প্রকট হইল তখন হিন্দু জাতীয়তা বোধে বাধিল। সুন্দরী যুবতী নজরুলের পিছনে লাগাইয়া দেওয়া হইল। নজরুল ফাঁদে পড়িলেন বিলীন হইল নজরুলের কবিত্ব শক্তি। এমন মেডিসিন খাওয়ানো হইল মাথার মগজের অর্ধেক পঁচিয়া গেল ব্রেন শক্তি হ্রাস পাইল তাই কবি নজরুলের মত প্রতিভাবন পুরুষ যদি প্রেমের ফাঁদে আটকা পরিতে পারে তবে সহশিক্ষার কারণে মেধাবী –যুবকগণকে যুবতীদের সাথে প্রেম করিবে এবং তাহাদের উজ্জল ভবিষ্যত বিনষ্ট করিবে; ইহাতো চূড়ান্ত সত্য কথা।

চরিত্র জলাঞ্জলি দিবে এবং বহু দিতেছে তাহা বিবেকবান মানুষ সহজেই বুঝিতে পারেন।

বেপর্দা ভাবে সহশিক্ষার কারণে বহু সংখ্যক যুবক ছাত্র ও যুবতী ছাত্রীদের রিতিমত লেখাপড়া করিবার পরিবর্তে প্রেমের ব্যাপারেই বেশী সময় নষ্ট করিতে দেখা যায়। পরীক্ষার সময় যখন বিদ্যার দরকার পরে তখন নকলের আশ্রয় নেয়। নকল প্রবণতার বহু কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

বেপর্দেগী বেহায়াপনার কারণে সমাজে যেনা ব্যাভিচারী কাজ এর হার বাড়ায় এবং ইহাতে রহমতের ফেরেস্তা ও আল্লাহর রহমত সমাজ থেকে উঠিয়া যায়।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে যখন অগ্নি কুন্ডে নিক্ষিপ্ত করিবার মানসে চরক গাছে বাঁধা হইল তখন রহমতের ফেরেস্তাগণ উক্ত চরক গাছে চড়িয়া থাকার কারণে হাজার হাজার মানুষ মিলেও চরক গাছ নামাইতে পারিতেছিলনা, অতঃপর বৃদ্ধ ঠাকুরের ছুরত ধরিয়া ইবলিস নমরুদকে বুদ্ধি দিল ঐ চরক গাছের নিকটে ব্যভিচারী কাজ করাইবার জন্য নমরুদ যখন ব্যভিচারী কাজ করাইল তখন রহমতের ফেরেশতা চলিয়া গেল। অত্র ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় দেশে রহমতের ফেরেশতা না থাকা এবং বিভিন্ন বালা মুসিবতের একমাত্র কারণ বেপর্দেগী ও পুরুষ নারীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ লাভ করা।

সুতরাং ব্যক্তি, সমাজ, ও রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এবং আদর্শবান করিবার জন্য শরায়ী বিধান পর্দা প্রথার বিকল্প নেই।

মহা সত্যের মহা সন্ধান

ড. আল্লামা খলিলুর রহমান

ইন্নাল, হামদা, লিল্লাহ–ওয়াছ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলা খাইরিল বারীয়য়াহ

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে লক্ষ্যাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। বিদায়ী হজ্জে আরাফার ময়দানে সূরা মায়দায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন– আজকার দিনে ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সেই পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম এর মূল শিক্ষা আকাইদ তাছাউফ ফিকাহ্। সেই পরিপূর্ণ শিক্ষা আজ ধর্মীয় বিদ্যালয় শিক্ষালয় ও খানকা হতে বিলুপ্ত। সূরাতুল বাকারার ১৭৭নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বাইজাবী, রুহুল মাআনী, রুহুল বায়ান, বায়ানুল কুরআন, আইসারুত্বাফাছির, তফছিরে ইবনে আজিবা, সিরাজুল মুনির, তানভীরুল আজহার, আদ্দুরুল মানসুর সহ অসংখ্য মহামান্য জগৎ বিখ্যাত তফসির সমূহে ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা আকাইদ তাছাউফ, ফিকাহ্ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পরিতাপের বিষয় সমগ্র দুনিয়া

জুড়ে পাঁচবেনা ছয় উসূল এর ইসলাম প্রচার করা হচ্ছে। অথচ হাজার বৎসর পূর্বে হুজ্জাতুল ইসলাম ঈমান গাজ্জালী (রহঃ) এর অমূল্য গ্রন্থ কিতাবুল আরবা–ই–না ফি উসুলিদ্দিন কিতাবে ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা (ফরজে আইন) চল্লিশ উসুল বর্ণনা করা হয়েছে। একজন খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য এই চল্লিশ প্রকার এলেম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য ফরজ এবং কামেল মুর্শেদ গ্রহণ করা ফরজ। অসংখ্য কিতাবে তাহার প্রমাণ রয়েছে। মোটকথা মহামান্য তফসির সমূহও সিহাহ্ সিত্তাহ্ সহ জগৎ বিখ্যাত হাদিস গন্থসমূহে ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা আকাইদ তাছাউফ ফিকাহ বলা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন– হে মুমিনগণ তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ দাখিল হও। ইহাই হইল পুর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম বা শরিয়াতে মুহাম্মাদি। কিন্তু জগৎতের মানুষ এ বিষয়ে অনেকেই বে–খবর।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারায় বলেন–ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খৃষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তারাও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

আল্লাহর কাছে বংশগত ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই। গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম, ইহুদী হউক, অথবা খৃষ্টান কিংবা মুসলমান–যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহর নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না। যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে।

কোরআন মজীদে আহ্লে–কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহর ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিস্ট্রারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সঃ) এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে শুধু দাবী করলে, মুসলমানরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলমানের ঔরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হয় না। বরং মুসলমান হওয়ার জন্য পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য (ফরজ)।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারী সত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খৃষ্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্, রসূল, পরকাল ও কেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করছে।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা পরকালে কোন মুক্তি পাওয়া যাবে না (সূত্র তফসিরে মারিফুল কুরআন–পৃঃ ৫৫)। আমার জানা মতে একহাজার বৎসর পূর্বে ঈমাম গাজ্জালী (রহঃ) যে এলেমের সন্ধান জগৎ বাসিকে প্রদান করে ছিলেন যুগে যুগে নায়েবে রসূলগণ সেই মহা সত্যের পতাকা উত্তোলন করে ছিলেন (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দিন ইসলাম)। সেই বিলুপ্ত পূর্ণাঙ্গ দিন ইসলাম এর সঠিক শিক্ষা মুজাদ্দে আজম আল্লামা হাতেম আলী (রহঃ) (আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তিনাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন) পরিপূর্ণভাবে সঠিক দলিল আদিল্লার মাধ্যমে জগৎ বাসিকে সেই মহা সত্যের মহা সন্ধান প্রদান করেছেন। অনেক কিতাব লিখে গিয়েছেন। যাহা জগতের মুমিন মুসলমান নর–নারীর জন্য মহা নিয়ামত। তাহার সুযোগ্য খলিফাদ্বয়, জামানার নায়েবে রসূলদ্বয়, আমার প্রাণ প্রিয় মুর্শেদে বরহক কামেল নায়েবে রসূল আল্লামা শাহ্ আব্দুল ওয়াহিদ ছাহেব ও আল্লামা শাহ্ আব্দুশ শাকুর ছাহেবদ্বয় আজীবন পূর্ণাঙ্গ দিনের বিশ্ব অভিযানে সদা–সচেষ্ট। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম কবুল করে কামেল নায়েবে রসূলের নিকট বায়আত হয়ে সিফাতী মুসলমান হয়ে পরকালের মহা মুক্তি ও আল্লাহ্র দিদার লাভের তৌফিক দান করুন। আমীন।

লেখকঃ দ্বীনি খেদমতে পৃথিবীর ৬৮টি রাষ্ট্র ভ্রমণকারী। সাবেক ঈমাম ও খতীব, নিউ ক্যাসেল সেন্ট্রাল জামে মসজিদ লন্ডন)

আত্মশুদ্ধির নাম প্রচলিত তরিকত

মাওঃ মোঃ নিজামউদ্দিন
প্রভাষক (আরবি) দুধল ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসা

আত্মশুদ্ধি করা মহান আল্লাহতায়ালার অন্যতম ফরয বিধান। আত্মশুদ্ধি ব্যতীত কোনো প্রকারের বন্দেগী আল্লাহতায়ালার দরবারে কবুল হবেনা। স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–----------
---------- মূলঅর্থঃ– কেয়ামতের দিন কোনে অর্থ সম্পদ এবং সন্তান সন্তনি কারো কোনো উপকারে আসবেনা। একমাত্র সে মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে। (সূরা শুয়ারা–৮৮, ৮৯)

রাসূল (সঃ) বলেছেন–---------- অর্থঃ নিশ্চয়ই মানুষের দেহের মধ্যে একটুকরা গোশত রয়েছে। যখন গোশ্ত টুকরা ভালো হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরটা ভালো হয়ে যায়। আবার যখন গোশত টুকরা খারাপ হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরটা খারাপ হয়ে যায়। সাবধান! সেই গোশতটুকরা হচ্ছে আত্মা। (বুখারী শরীফ)

বর্তমানে দেখা যায় মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন দরবারে গিয়ে পীরদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন। পীর ছাহেবরা মুরীদদেরকে চিশতিয়া, কাদ্রিয়া, নকশাবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া সহ বিভিন্ন তরিকার জিকির আজকার বাতলিয়ে দিয়ে থাকেন। মুরীদরা মনে করেন– পীরের এই বাতলানো তরিকত মনে–প্রাণে আদায় করতে পারলেই নাজাতের সার্টিফিকেট যোগাড় হয়ে যাবে। এখন প্রত্যেকের জানা উচিত, আত্মশুদ্ধি ও তরিকত কী জিনিস? এবং প্রচলিত নকল তরিকা দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্ভব কিনা?

প্রিয় পাঠকবন্ধুগণ! আত্মশুদ্ধির বিদ্যাকে আরবি ভাষায় ইলমে ক্বলব বলা হয়। এর আরো কতিপয় নাম রয়েছে। যথা: ইলমে তাছাওউফ, ইলমে আখলাক, ইলমে লাদুন্নি, ইলমে আসরার ইত্যাদি। এখন জানা দরকার– ইলমে তাছাওউফ কাকে বলে? শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃঃ লেখা আছে–

---------- অর্থঃ ইহা এমন এক বিদ্যা যার মাধ্যমে অন্তরের সৎস্বভাবের পরিচয় ও উহা অর্জনের পদ্ধতি জানা যায় এবং অন্তরের অসৎ স্বভাব সমূহের পরিচয় ও উহা বর্জনের পদ্ধতি জানা যায়।

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের অন্তরে দুইজাত স্বভাব বিরাজমান। একজাত স্বভাব খারাপ যা মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় আর একজাত স্বভাব ভালো যা মানুষকে মহামুক্তির সন্ধান দেয়।

মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন–

---------- অর্থঃ– অতঃপর তিনি আত্মার মধ্যে ---------- সৎস্বভাব ও অসৎস্বভাব ঢেলে দিয়েছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে অবশ্যই সফল কাম হবে এবং যে নিজেকে কলুষিত রাখে, সে অবশ্যই নিরাশ হবে। (সূরা শামছ)

অন্তরের মধ্যে অনেক অসৎ স্বভাব রয়েছে যথাঃ কিবর (অহংকার), হাসাদ (হিংসা) বোগজ (অন্তরে শত্রুতা পোষণ করা), গযব (রাগ গোস্সা), হেরছ (অবৈধ লোভ), বোখল (কৃপণতা), রিয়া (লোক দেখানো বন্দেগী), গুরুর (অন্তরে ভুল ধারণা) ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে অন্তরের মধ্যে অনেক সৎস্বভাব রয়েছে। যথাঃ তাওবাহ, ছবর (ধৈর্য ধারণ করা), শোকর, তাওয়াক্কুল (ভরসা রাখা), ইখলাছ (একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) মহব্বত, মোরাকাবা, মোহাছাবা ইত্যাদি।

শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৪০ পৃ: আরো উল্লেখ আছে।

---------- মূলঅর্থঃ– অন্তরের অসৎ স্বভাব সমূহ দূর করতে হলে উল্লেখিত স্বভাব সমূহের সংজ্ঞা, উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিধান এই চার ধারার মাসয়ালা জানা ফরজে আইন।

এখন উল্লেখিত চার ধারার মাসআলা জেনে আত্মা থেকে অসৎ স্বভাবসমূহ দূর করা এবং সৎ স্বভাবগুলো অন্তরে অর্জন করাই রাসূল (সঃ) এর সত্যিকারের তরকা বা সুন্নাত বা আদর্শ। রাসূল (সঃ) হযরত আনাস (রাঃ) কে বলেছেন–
---------- অর্থঃ– হে বৎস" তুমি যদি এরূপে সকাল–সন্ধায় উপনীত হতে পার যে, তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো হিংসা বিদ্বেষ নেই, তবে তা কর। হে বৎসঃ আর এটাই হল আমার সুন্নাত বা আদর্শ। আর যে আমার আদর্শকে ভালোবাসবে সে আমাকেই ভালোবাসবে আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমার সাথেই জান্নাতে থাকবে।
এখন আত্মশুদ্ধির নামে পীরানা দরবার থেকে বাতলানো প্রচলিত জিকির আজকারের তরিকত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যক।
শামী কিতাবের ১ম খন্ডের ৬২১ পৃঃ লেখা আছে–---------- অর্থাৎঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ মস্‌জিদে কিংবা অন্য জায়গায় জামাতের সাথে জিকির করা যে মুস্ত াহাব, তার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের জিকিরের আওয়াজে যেন কোনো ঘুমান্ত ব্যক্তি কিংবা কোনো নামাজী কিংবা কোনো অধ্যায়নকারীর (কুরআন তেলাওয়াত কারীর) কষ্ট না হয়।
এখন চিন্তার বিষয়, মৌখিক জিকির আজকার করা মুস্তাহাব আর চার ধারার মাসআলা জেনে আত্মশুদ্ধি করা ফরজে আইন। তাহলে মুস্তাহাব জিনিস দ্বারা কী ফরজ আদায় হওয়া সম্ভব?
নিশ্চয়ই না। সুতরাং প্রচলিত জিকির–আজকারের নফল তরিকা দ্বারা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা সম্ভব নহে।

ইসলামে নারীদের করণীয়

শাহজাদি খালেদা আমিন
আহবায়ক
হযরত হাতেম আলী (রহঃ)ফাউন্ডেশন (HARF), কেন্দ্রীয় মহিলা শাখা

সোনালী ইতিহাসের সাক্ষ্যঃ

ইসলামে যিনি প্রথম ঈমান এনেছেন তিনি একজন নারী উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদিজা (রাঃ), ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যিনি শাহাদাত বরণ করেছেন তিনিও একজন নারী হযরত সুমাইয়া (রাঃ), নবুওয়াতের কথা প্রথম যিনি জানতে পেরেছিলেন তিনিও একজন নারী উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদিজা (রাঃ)। সৃষ্টির ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা পবিত্র মি'রাজের কথা সর্বপ্রথম যিনি জানতে পারেন তিনিও নারী বিবি উম্মে হানী (রাঃ)। রাসূল (সঃ) এর পারিবারিক জীবনের খুঁটি নাটি তথ্যাদি সুন্দর, সুষ্ঠুভাবে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যে সব হাদীস প্রতিফলিত হয়েছে তাও আমরা পেয়েছি একজন নারীর মাধ্যমে তিনি উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)। সর্ব কালের সর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ ধারা যার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে তিনিও একজন নারী হযরত ফাতিমাতুজ জুহরা (রাঃ), এমনকি হযরত আবুবকর (রাঃ) সঙ্কলিত যে "সহীফা" অবলম্বনে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন শরীফের ঐতিহাসিক অনুলিপিসমূহ প্রণয়ন করেন সেই সহীফা সংরক্ষিত ছিল একজন নারীর কাছেই তিনি উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো এমনিতেই কাকতালীয় ভাবে ঘটেনি বরং তাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আল্লাহর বিধানের মধ্যে থেকেই ইসলাম প্রচার–প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক ভাবে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ইতিহাস রচিত হয়েছে। আল্লাহর অলংঘনীয় নির্দেশ পর্দার অন্তরালে থেকেও দ্বীন জারি কায়েমে নারীদের স্বতস্ফুত অংশগ্রহণের অনুপম দৃষ্টান্ত রাসূল (সঃ) এর সাহাবা আজমাঈন (রাঃ), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের জামানায় এবং ইসলামী ঐতিহ্যের যুগে যুগে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বীনি ইলেম শিক্ষার ফরজিয়াত নারী–পুরুষ সকলের আর দ্বীনি বিদ্যা চর্চা নারী ও পুরুষ সাহাবা (রাঃ) যার যার অবস্থানে থেকে সমান তালে চালিয়ে গেছেন যার উদাহরণ হতে পারে হযরত আয়েশা (রাঃ); যিনি শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে তার

অবস্থান দ্বিতীয় তিনি ব্যতীত ও অনেক মহিলা সাহাবা (রা:) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনেক মাসয়ালার সমাধানে যখন পুরুষ সাহাবা (রা:) পৌঁছতে পারেনি তখন আয়েশা (রা:) তার সমাধান দিয়েছেন। হযরত রাবেয়া বসরি (রা:) কথা সকলের জানা; যার খোদাভীতি বিশ্বময় সমাদৃত। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারী সাহাবা (রা:) গণ পর্দার অন্তরালে থেকেই ইলেম শিখেছেন অন্য মহিলাদের শিখিয়েছেন, স্বামীদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালিত হতে উৎসাহিত করেছেন। ছেলেদের দ্বীনের মোজাহিদ রুপে দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন। মেয়েদেরকে ইসলামী আইন মেনে চলতে শিখিয়েছেন।

জাতির কর্ণধর যোগ্য মাতা, যোগ্য বোন, যোগ্য স্ত্রী রুপে গড়ে তুলেছেন। কু শিক্ষার প্রভাব থেকে নিজেরা মুক্ত রয়েছেন অন্যদের মুক্ত রেখেছেন। তাদের উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছেন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালন করেছেন কখনো অনাধিকার চর্চা করতে যাননি। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অলংঘনীয় বিধান পর্দার বাহিরে গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা, সমান অধিকারের মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ঘৃণিত কাজে অংশগ্রহণ করেননি এবং তারা প্রমাণ করেছেন নারীদের জাগরণ কিভাবে হয় তারাই রেখে গেছেন সোনালী ইতিহাসের সাক্ষ্য।

নারীদের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে নারী অধিকারের অগণিত সংগঠন থাকার পরেও নারীদের মাঝে সুখের নীড়টি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। একটি সমীক্ষার ফল দেখে আৎকে উঠতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে যত আত্ম হত্যার ঘটনা ঘটে তার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী ঘটে পারিবারিক কলহের কারণে। আর যারা আত্ম হত্যা করে তার অধিকাংশই হচ্ছে নারী এবং তাদের অধিকাংশের বসবাস শহর কেন্দ্রীক। এ তো হলো বাংলাদেশের অবস্থা আর বিদেশের অবস্থা তো আরো ভয়াবহ। আমাদের পার্শ্বের রাষ্ট্র ভারতে বাবা–মা তার মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে দিনের বেলাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনা যে তাদের মেয়ে ইজ্জত নিয়ে বাসায় ফিরতে পারবে কিনা।

গণতন্ত্রের ধারক বাহক বলে দাবিদার আমেরিকায় মিনিটে ১শত নারী সম্ভ্রম হারায়। এভাবে বলতে গেলে লেখা অনেক দীর্ঘ হবে। পৃথিবীতে যত এসিড নিক্ষেপ হয় তার অধিকাংশ শিকার নারী। ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদের স্লোগানধারী ভারতে জীবন্ত শিশু হত্যা তো নিত্য দিনের ঘটনা। রাষ্ট্র পরিচালনার গদি দুই যুগের অধিক সময় ধরে নারীরা দখল করার পরেও মা–বোনদের প্রতি সেই সোনালী দিনের মতো শ্রদ্ধা বোধ, মায়া–মমতা, স্নেহের পরশ আজ কল্পনার বস্তুতে রূপ নিয়েছে।

এর একমাত্র কারণ বর্তমান নারী সমাজ তাঁর দ্বায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন। তার মূল দ্বায়িত্ব ছেড়ে ন্যায্য অধিকার ছেড়ে অনধিকার চর্চায় লিপ্ত। তাঁর পূর্বের সে সম্মান ফিরে পেতে হলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তার অধিকার দ্বায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। কারণ যখন মুসলিম রমনীরা তাদের দ্বায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। সে যুগে মুসলিম রমনীদের প্রতি নারী নির্যাতন, পারিবারিক আত্মকলহ, এসিড নিক্ষেপ, সম্ভ্রম হানি, আত্ম হত্যা, জীবন্ত মেয়ে কবর দেয়ার মত কোনো জঘন্য ঘটনার উপমা মিলবেনা বরং পৃথিবীর ইতিহাসে নারীদের সব থেকে নিগৃহিত, নির্যাতিত অধিকার বঞ্চিত থেকে রক্ষা পেয়েছিল পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েই। নিজেদেরকে আবিস্কার করেছিল সোনালী ইতিহাসের সাক্ষ্য রুপে।

নারীদের করণীয়ঃ

আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত ইরশাদ করেন

---------- অর্থাৎ মু'মীন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে আমলে সলেহ্ (ফিকাহও তাছাওউফ শিক্ষা তদানুযায়ী আমল) করে আমি তাকে নিশ্চয়ই পবিত্র (সুখ–শান্তির) জীবন দান করব। (সূরা নাহল–৯৭) এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট হয় আমলে সলেহা শুধু পুরুষদের প্রদান করা হয় নাই বরং নারীও পুরুষ উভয়কে আমলে সলেহা তথা ফিকাহও তাছাওউফ শিক্ষা তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নির্দেশ পালনে সক্ষম হলে সুখ শান্তির মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে পবিত্র জীবন প্রদানের অঙ্গিকার মহান আল্লাহ ব্যক্ত করেছেন। তবে আল্লাহর অঙ্গিকারের সুফল পেতে হলে আরো দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ ইসলাম বিরোধী সকল কার্যক্রম থেকে নিজেদের দূরে সড়িয়ে রাখতে হবে। বাঁধা প্রদানের ক্ষমতা না থাকলে অন্ততঃ নিজেকে তাদের চিন্তা চেতনা কার্যক্রম থেকে

আর্থিক, শারিরীক, মানসিক সমর্থন, সহযোগিতা থেকে দূরে সরে আসতে হবে। অন্যথায় মুনাফিক হিসেবে নাম লিখিয়ে নারী সমাজের বর্তমান দূর্দশা আরো বৃদ্ধি করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

মুনাফিক নারী ও মুনাফিক পুরুষ পরস্পর সংঘবদ্ধ। তারা সকলে মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভাল কাজের নিষেধ করে। আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে আল্লাহ ও তাদের ভুলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকরাই সীমালংঘনকারী (সূরা তাওবা)।

এ আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যায় যারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের সংগঠন ব্যতিত অন্য কোনো সংগঠনকে কোনো সাহায্য করবে, অর্থ দ্বারা সাহায্য করবে কিংবা কোনোভাবে সাহায্য করা অর্থাৎ তাদের চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী হওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং নিজ পরিবারকে মুক্ত রাখায় সচেষ্ট হতে হবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাসূলের জামানার নারীদের রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে হবে। প্রচলিত ধারণা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব শুধু পুরুষের এ চিন্তা থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। তার মানে পর্দার হুকুম অমান্য করে পুরুষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়াও চলবেনা। রাসূল (স:) এর সময়ে মহিলারা পর্দার অন্তরালে থেকেই দ্বীন শিখেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় স্বামীদেরকে উৎসাহিত করেছেন, ছেলে–মেয়েদের ইসলামী আকিদার মাঝে লালন পালন করে মুজাহিদ রুপে তৈরি করেছেন। হাদীস সাক্ষ্য দেয় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন দান চাওয়া হতো মহিলারাও সে ডাকে সাড়া দিয়ে স্বত:স্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করত। এমনকি জাহান্নামের ভয়ে জান্নাতের আশায় আল্লাহ ও রাসূল (স:) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের ঘরে রক্ষিত স্বর্ণগুলো আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত তারা অগণিত বার স্থাপন করেছেন। তারা নিজেদের জীবনের থেকে প্রিয় করে নিয়েছিলেন দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে এবং তা করেছেন আল্লাহর বিধানের মধ্যে থেকেই। আর আল্লাহ মু'মীনদের পরিচয় দিতে গিয়ে এরশাদ করেন।

ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী পরস্পরের সহায়ক। তারা সংঘবদ্ধভাবে সব ভাল ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করে, সব অন্যায় ও পাক কাজ থেকে নিষেধ করে। তারা নামাজ আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহও তার রাসূল (স:) এর আনুগত্য করে। আল্লাহ এদের অবশ্যই রহমত দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজয়ী মহাজ্ঞানী (সূরা তাওবা)

বস্তুতঃ আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নারী ও পুরুষ উভয়ের। আর এ কাজটি করতে হলে সংঘবদ্ধ হওয়া অর্থাৎ সংগঠন ব্যতিত অনেকটা অসম্ভব। তাই পুরুষরা যেমন পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের সংগঠন হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন (HARF) এর সদস্য হয়ে দ্বীন জারি কায়েমে অবতীর্ণ। তেমনি মহিলা দেরকেও বেদ্বীনের মতাদর্শ থেকে মুক্ত থেকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের পাঠ্যগুলো পাঠকরে নিজেকে ইসলাম বিদ্বেষীদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং আমাদের চার পাশে অবস্থানরত মা–বোন, দাদী–নানী, মেয়েদেরকে ইসলামী আলোতে আলোকিত করার একটি প্লাট ফর্ম হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন (ঐঅজঋ) মহিলা শাখার সদস্য হয়ে এবং মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্রীবৃন্দ। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ছাত্রী জমিয়াতের সদস্য হয়ে সংগঠনের পাঠ্যগুলো পড়ে। পর্দার অন্তরালে থেকে সচেতন মুসলিম রমনি হতে। এবং নারীদের ইসলামে করণীয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করে আবারো ফিরিয়ে আনতে পারেন সে সোনালী দিনগুলো। যে দিনগুলোর অপেক্ষায় জাতি আজ চেয়ে আছে।

দানের গুরুত্ব ও মোয়ামালাত ব্যাংক প্রসঙ্গ

এ.এম.এম. তানভীর হাসান আল মাহমুদ
পরিচালক, হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন (HARF)

আল্লাহর নির্দেশঃ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত কুরআন মাজীদে একাধীকবার পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম বিশ্বময় প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সঠিক স্থানে তথা আল্লাহর রাস্তায় দানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ---------- হে মুমীনগণ! তোমরা দান কর;

আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবেনা। (সুরা বাকারা–২৫৪)
অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন–
তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ (জান্নাত) লাভ করতে পারবেনা যে পর্যন্ত না তোমার প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে। (সূরা আল–ইমরান–৯২) ---------- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেন মহান আল্লাহ বলেছেন– হে আদম সন্তানেরা তোমরা অকাতরে দান করতে থাকো, আমিও তোমাদের উপর ব্যয় করবো, নবী (সঃ) আরো বলেন আল্লাহর হাত প্রাচুর্যে–পূর্ণ। রাত দিন অনবরত ব্যয় করলেও তা মোটেই কমছেনা। (মুসলিম ৩য় খন্ড–২১৭৯) ----------
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন এ আয়াত নাযিল হইল তোমাদের প্রিয় বস্তু হতে ব্যয় (দান) না করা পর্যন্ত কিছুতেই কল্যাণ (জান্নাত) লাভ করতে পারবেনা" আবু তালহা (রাঃ) বলেন, এইতো মহা সুযোগ। আমাদের প্রতিপালক নিজেই আমাদের মাল থেকে চাচ্ছেন। তাই হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি আপনাকে সাক্ষি রেখে আমার (বীরে হা) নামক বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। (হাদীস অংশ) মুসলিম শরীফ ৩য় খন্ড–২১৮৭)

ফজিলাত (গুরুত্ব)ঃ

আর তোমরা যা দান কর আল্লাহ তার প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা সাবা–৩৯)
---------- তারা অল্প বা বেশী যা কিছু খরচ করুক না কেন---------- এসব (অর্থাৎ দানের প্রতিদান) তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন। (সূরা তাওবাহ–১২১)---------- আবু ইয়াহইয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাত শতগুণ সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী)।
হযরত আদী ইবনে হাতিম তাই (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন সবার সাথে তোমার রব কথা বলবেন। তখন সে (আল্লাহ) তার (বান্দার) ডান দিকে লক্ষ্য করবে এবং পূর্ব যা পাঠিয়েছে তা ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেনা তারপর বাম দিকে লক্ষ্য করবে এবং পূর্বে যা পাঠিয়েছে তাছাড়া কিছুই দেখতে পাবেনা। এর পর সামনের দিকে লক্ষ্য করবে এবং জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেনা।
(অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কোনো সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে আমল নামায় কোনো নেকী যুক্ত না হওয়া) সুতরাং তোমরা খেজুরের এক টুকরা দিয়ে হলেও (অর্থাৎ সামান্য দান দিয়ে হলেও) জাহান্নামের আগুন থেকে আত্ম রক্ষা কর। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেছেন দানশীলতা একটি বৃক্ষ যার মূল জান্নাতে আর ডাল–পালা দুনিয়াতে ঝুঁকে রয়েছে। যে তার কোন ডাল আকড়ে ধরবে তাকে সে (তার দান) অবশ্যই জান্নাতে নিয়ে যাবে। (তানযীহুশ শরীয়াহ ২য় খন্ড–১৩৯ পৃষ্ঠা)
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন। আকাশের দরজায় দন্ডায়মান হয়ে এক ফেরেস্তা বলে যে ব্যক্তি আজ ঋণ দিবে (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম প্রচার–প্রসারে দান করবে) আগামীকাল (হাশরের ময়দানে) তা (এর প্রতিদান) পাবে। আরেক ফেরেস্তা ঘোষণা করে হে মানুষ মৃত্যুর জন্য জন্ম গ্রহণ কর আর ধ্বংসের জন্য নির্মাণ কর।
(মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যেই মুসলমান কোন মুসলমানকে একখানা কাপড় পরিধান করাবে সে আল্লাহ পাকের খাছ হেফাজতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দানকৃত কাপড়ের অংশ গৃহীতা মুসলমানের পরনে থাকবে (তরিমিযী) ----------
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন। যে ব্যক্তি তার হালাল উপর্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ কিছু দান করবে, আর আল্লাহপাক পবিত্র। তিনি হালাল বস্তু ব্যতিত কিছু কবুল করেন না। আল্লাহপাক তাঁর দান ডান হাতে (সম্মানের সাথে) গ্রহণ করেন,

অতঃপর তিনি গৃহীত দানকে লালন পালন করেন, যেমনিভাবে তোমাদের কেহ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন–পালন করে থাকে। অবশেষে ঐ দান পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ইয়া রাসুলাল্লাহ (সঃ) উত্তম মুসলমান কে? তুমি অন্যকে খাদ্য খাওয়াবে পরিচিত ও অপরিচিত লোককে সালাম দিবে (বুখারী শরীফ)।

রাসূল (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার রোগের খোঁজ খবর নেওনি। সে বলবে, ইয়া আল্লাহ আমি কি করে আপনার রুগ্নাবস্থার খবর নিতে পারি? আপনি তো রব্বুল আ'লামীন সমস্ত সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। আল্লাহ বলবেন তোমার কি জানা নেই আমার অমুক বান্দা রুগ্ন হয়েছিল। যদি তুমি তাঁর রুগ্নাবস্থায় খোঁজ খবর নিতে তবে আমাকে সেখানে পেতে। হে বনী আদম আমি তোমাকে খাইয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে ইয়া আল্লাহ আমি কি করে আপনাকে খাওয়াতে পারি? আপনিতো রব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলবেন আমার অমুক বান্দা খেতে চেয়েছিল, তুমি তাকে খাওয়াও নি। যদি তাকে খাওয়াতে তবে তা আমার কাছে পেতে। হে বনী আদম আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে ইয়া রব! আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো রব্বুল আলামীন। আল্লাহ বলবেন আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি করাতে তবে তা আমার কাছে পেতে (মুসলিম শরীফ)।

হাদীস শরীফে রয়েছে, সদকাকারী (কেয়ামতের দিন) আপন সদকার ছায়ায় থাকবে, এমনকি এ অবসস্থায়ই মানুষের (হিসাব নিকাশ) ফয়সালা হবে। (মুসলিম)

যে নিজের মিসকীন ভাইকে পেট পুরে খাওয়াবে এবং পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সাত খন্দক পরিমান দূরে রাখেন। একেক খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশ বছরের সমান।

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, সদকা (দান) এমনভাবে গোনাহ দূর করে যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। (মুকাশফাতুল কুলুব)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) দুইটি বস্তায় ভরিয়া অনেক সম্পদ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরিমাণ প্রায় একলক্ষ আশি হাজার দিরহাম ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) একটি বড় পাত্রে করিয়া তাহা লোকের মধ্যে বন্টন (দান) করিয়া দিলেন। (মুসলিম শরীফ)

দানের পথে বাঁধা

দানের পথে বাঁধা প্রধানত দুই ধরনের

১। শয়তানের পক্ষ থেকে

২। কু–পাত্রে দান

১। শয়তান মানুষকে ভয় দেখায় যদি তুমি দান কর তাহলে তোমার সম্পদ হ্রাস পাবে তুমি গরীব হয়ে যাবে। অর্থাৎ দান সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি তৈরি করা। কোরআন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছে–

---------- **অর্থাঃ–** শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ (দানের কারণে) তোমাদেরকে তাহার ক্ষমা অনুগ্রহের (মাল রাশি বৃদ্ধি করার) প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচূর্যময়, সর্বজ্ঞ।

কু–পাত্রে দানঃ মূল্যবান জিনিসের মূল্য থাকে যতক্ষণ তা মূল্যবান পাত্রে রাখা হয়। কিংবা মূল্যবান জিনিসের সাথে ভেজাল মিশ্রিত না হয়। যেমনঃ এক বালতি দুধ এমন একটি পাত্রে রাখলেন যে পাত্রের নিচে কিছু প্রসাব জমে আছে কিংবা দুধ ভালো পাত্রেই রাখলেন। ভালো করে সংরক্ষণ না করায় নাপাক বস্তু মিশ্রিত হয়েছে তখন যেমন ঐ দুধের মূল্য থাকেনা ঠিক তেমনি ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ, অপসংস্কৃতি, গান, বাদ্য, বিধর্মী এনজিও এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের মাসয়ালা বিলুপ্ত কারীদের কোন কার্যক্রমে দান করা। এ দানের মাধ্যমে শয়তানের হাত শুধু শক্তই হয়না। পূর্ণাঙ্গ

দ্বীন ইসলামের কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহর গজবে পতিত হয়। কুরআন মাজীদে ইরাশাদ হচ্ছে– আল্লাহ গজবে পতিত হয়–----------
---------- কাফেরগণ তাদের মাল ব্যয় করে আল্লাহর পথে বাঁধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্যে। এখন তারা আরো ব্যয় করবে, এভাবে অচিরেই এই মাল খরচ তাদের অনুতাপ–অনুশোচনার দূর্ভাগ্যের কারণ হবে। অতঃপর তারে পরাভূত হতে হবে। পরিনামে কাফেরদের জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। (সূরা আনফাল–৩৬) রাসূল (সঃ) ইরাশাদ করেন, আর দূর্ভাগা সে ব্যক্তি যার হাত দিয়ে বিশৃঙ্খলা এবং দুস্কৃতি প্রকাশিত হয়।

অতএব, একথা প্রতিয়মান যে, দানের পথে প্রথম বাঁধা তথা অন্তরের মাঝে দান সম্পর্কে বাজে প্রশ্নের উদয় হয়, শয়তানের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় প্রকার বাঁধা কুপাত্রে দানের আহবান আসে মানব শয়তানের থেকে। আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় হতে হলে শয়তানকে চিনে তার বাঁধা অতিক্রম করতে হবে।

দান সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাঃ দান সম্পর্কে সমাজ প্রচলিত মারাত্মক ভুল ধারণা হচ্ছে। বিপদে পড়লেই বোধহয় দান করতে হয়। অসুখ, বালা–মুসিবাত কিংবা কোনো সমস্যায় পড়লে তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য দান করে থাকে। উদ্দেশ্যপূর্ণ হলে দানের কথা বেমালুম ভুলে যায়।

সমাজে প্রচলিত আরেকটি ভুল ধারণা হচ্ছে যারা বিত্তশালী ধন সম্পদের মালিক দানের হুকুম শুধু মাত্র তাদের জন্যই কোরআন মাজীদে এবং হাদীস শরীফে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিয়মান হয়েছে।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন–----------
---------- যারা স্বচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা (অন্তরের অসৎ সভাব) গজব (রাগ) কে (কিতাবের বিধান অনুযায়ী) নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকে ক্ষমা করে এসব লোককেই আল্লাহ ভাল বাসেন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কেহ সুস্থ অবস্থায় এক দিরহা দান করা মৃত্যুর সময়ে একশত দিরহাম অসিয়ত করে যাওয়া থেকে উত্তম (তাম্বিহুল গাফেলীন)

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে প্রতিয়মান হয় বালা মুছিবতি ছাড়া সর্বদা–সর্বাবস্থায় দান করলে সওয়াব ও শতগুণ বেশি।

যেখানে এ আমানত নিরাপদঃ ধন–সম্পদ আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। হাশরের প্রান্তরে প্রত্যেকের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা এ আমানতের হিসাব গ্রহণ করবেন। অতএব এমন স্থানে এ আমানত গচ্ছিত রাখা উচিৎ যেথায় নিরাপদ থাকবে এবং হাশরের প্রান্তরে উপকারে আসবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যদি তুমি তোমার সম্পদকে এমন স্থানে জমা রাখতে চাও যেখানে পোকা খাবেনা, ডাকাতেও ছিনিয়ে নিবেনা তাহলে দান–সদকা করে দাও (তাম্বিহুল গাফেলীন)। অবশ্য সে দান হতে হবে সঠিক পাত্রে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) এর পথে। রাসূল (সঃ) এর রেখে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা আকাইদ, তাছাওউফ ও ফেকাহের সমন্বয়ে দ্বীন যা পৃথিবী থেকে আজ বিলুপ্ত আর এ দ্বীনের পূর্ণ রূপটি কোরআন-সুন্নাহ ও অতীব যুগের নায়েবে রাসূলদের কিতাবের অকাট্য দলীলের মাধ্যমে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন মোজাদ্দেদে আ'জম আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোঃ হাতেম আলী (রহঃ)। তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তার রেখে যাওয়া পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের মিশনকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া আমাদের দ্বায়িত্ব। আর এ দ্বায়িত্বের প্রেরণা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোজাদ্দেদে আজমের নামে "হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন (HARF) । আর উক্ত ফাউন্ডেশন উচু–নিচু, ধনী–দরিদ্র, শ্রমিক, দিনমজুর চাকুরিজীবী, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ছাত্র, শিক্ষক, পুরুষ, মহিলা সমাজে পূর্নাঙ্গ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে কুরআন–সুন্নাহ সমর্থিত পরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছে। যার মূল লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর সন্তুষ্টি অর্জন। আর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন জারি কায়েমের লক্ষ্যে নেয়া এ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা প্রতি মু'মীনের কর্তব্য।

ইরশাদ হচ্ছে–---------- অর্থাৎ তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ করেনা এবং আল্লাহর পথে প্রাণ

ও ধন সম্পদ দ্বারা জেহাদ (পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় প্রাণ–পণ চেষ্টা) করে তারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত (----------)। হযরত হাতেম আলী (রহঃ) ফাউন্ডেশন (HARF) এর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে যাতে সকল মানুষ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "মোয়ামালাত ব্যাংক" যা একটি ছোট্ট টেবিল ব্যাংক। যা আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কবুল করেছেন, তা সীমিত সময়ের মধ্যেই প্রমানিত হয়েছে। এ ব্যাংকে মানত করে তার ফলাফল প্রাপ্তির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে রয়েছে। আপনিও এ ব্যাংকটি সংগ্রহ করতে পারেন। আপনার নিকটস্থ কোনো (HARF) এর সদস্যের মাধ্যমে কিংবা এর (ঐঅজঋ) অফিসের নম্বরে যোগাযোগ করে এবং আপনার আয় থেকে কিছু টাকা অর্থাৎ আপনি বাজার করে আসলেন কিংবা কোনো কাজ থেকে বাসায় ফিরলেন অনেক সময় দেখা যায় খুচরা কিছু টাকা বা পয়সা পকেটে আছে আপনি হাশরের দিনের জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিতে অর্থাৎ মোয়ামালাত ব্যাংকে রেখে দিলেন। কিংবা কোথাও যাচ্ছেন পথের বালা মুসিবত থেকে যেন আল্লাহ হেফাজত করে এ উদ্দেশ্যে কিছু পয়সা/টাকা দান করলেন।

ইরশাদ হচ্ছে–---------- তারা কি এটা জানেনা যে আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তিনিই দান খয়রাত কবুল করেন (কুদরতি ভাবে) নিজে "মোয়ামালাত ব্যাংক" সংগ্রহ করে দান করুন এবং অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করুন। আপনার উৎসাহে কেহ দান করলে আপনিও তার দান পরিমাণ সওয়াব পাবেন তাতে দানশিলের সওয়াব থেকে কিছু কমবেনা। আল্লাহ আমাদের সকলকে কৃপণতার গজব থেকে মুক্ত করে দানশিলের দলভুক্ত হয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান গনী (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) সাথে হাশরে বসার তাওফিক দিন (আমিন)।

যে বাণী চির অম্লান

(উপদেশ সংকলন)

✱ দুশ্চরিত্র মন্দ প্রকৃতি ও রুক্ষভাষী লোক বেহেস্তে প্রবেশ করবেনা। (আল হাদীস)

✱ আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, রবং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তকরণ ও আমলসমূহ) (আলহাদীস)

✱ আল্লাহ তায়ালার কাছে সবচেয়ে বেশি খারাপ ও ঘৃণিত ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি না হক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বেশি ঝগড়া করে। (আল হাদীস)

✱ নিরীবিলী পরিবেশে তরকারী বিহীন খানা উত্তম ঐ ঘর থেকে, যা সম্পদে পরিপূর্ণ বটে কিন্তু ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে। (হযরত সোলাইমান আঃ)

✱ দুষ্ট লোকদের ঘরে আল্লাহর নেয়ামত থাকে বটে কিন্তু বরকত থাকে সত্যবাদীদের ঘরে। (হযরত সোলায়মান (আঃ)

✱ নিজের মনকে খুব সংরক্ষণ কর কেননা জীবনের মূল কেন্দ্রই হল মন। (হযরত সোলাইমান (আঃ))

✱ যদি তুমি জ্ঞানী হও তা তোমার উপকারে আসবে। আর যদি তুমি বিদ্ধপকারী হও তাহলে তুমি উহার পরিনাম ভোগ করবে। (হযরত সোলাইমান (আঃ))

✱ দানশীল ব্যক্তির আত্মা খুবই প্রশস্ত অন্যকে পরিতৃপ্তিকারী নিজেও তৃপ্ত হবে। (হযরত সোলাইমান (আঃ)

✱ বিবেক শূন্য রমনীর সৌন্দর্য হচ্ছে স্বর্ণের নথ পরানোর ন্যায়। (হযরত সুলাইমান (আঃ))

✱ নেক্কার স্ত্রী স্বামীর জন্য মুকুট স্বরূপ ও অনুতাপকারীনি স্ত্রী হাড়ে পচন ধরার ন্যায়। অর্থাৎ তার দ্বারা স্বামী সদা দুর্ভোগ পোহায়। (হযরত সুলাইমান আঃ))

✱ বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের জ্ঞান গরীমা লুকিয়ে রাখে আর নির্বোধ লোক নিজের নির্বুদ্ধিতার ঢোল বাজিয়ে থাকে। (হযরত সুলাইমান আঃ))

✱ তুমি নির্বোধ লোককে কখনও ভাল কথা শুনাতে পারবেনা। কেননা সে তোমার জ্ঞানগর্ব কথা তুচ্ছের নজরে দেখবে। (হযরত সুলাইমান আঃ))

✱ অপরের আনন্দ পরিতৃপ্তি ও প্রাচুর্যের প্রতি ঈর্ষা করোনা কেননা তাদের এ আরাম দায়ক জীবন মাত্র কয়েক দিনের জন্য। (হযরত ইদ্রীস (আঃ)

✱ দুনিয়ার মঙ্গল অনুতাপ স্বরূপ এবং অমঙ্গল অপমান স্বরূপ। (হযরত ইদ্রীস আঃ))
✱ উহাই নেক কাজ যা মানুষের প্রশংসার আশা মুক্ত হয়ে করা হয়। (হযরত ঈসা আঃ))
✱ তুমি জগতের আলোকবর্তিকা হও তাহলে শহর পাহাড় যে খানেই তোমাকে রাখা হবে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারবেনা।
✱ ইবাদতের গর্ব-অহংকার করা থেকে গুণাহর জন্য লজ্জিত হওয়া ভাল।
✱ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাজে লিপ্ত থাকে আল্লাহ তার কাজে লিপ্ত থাকেন।
✱ ঐ ব্যক্তির দূর্ভাগ্য যে মৃত্যু বরণ করে এবং মৃত্যুর পরেও তার গুনাহ অবশিষ্ট থাকে।
✱ নিজের বোঝা অপরকে দিওনা উহা কম হোক বা বেশি হোক।
✱ দান দক্ষিণা সম্পদের ফসল, আমল হল ইলেম বা জ্ঞানের ফসল। (হযরত ওসমান (রাঃ)।
✱ অপাত্রে সম্পদ ব্যয় করাটা সম্পদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মাত্র। (হযরত ওসমান (রাঃ)
✱ লোকদেরকে পরীক্ষা করতে গেলে তুমি তাদেরকে বিষক্ত জানোয়ার থেকে কম পাবে না। (হযরত ওসমান (রাঃ)।
✱ সঠিক পথে লোক সংখ্যায় কম; কিন্তু সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাঁরা অধিক বটে। (হযরত ওসমান (রাঃ)।
✱ অর্থ উপার্জন করিয়া বিধবা, এতীম এবং গরিবদের সাহায্য করিলে জেহাদের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। (বোখারী মুসলিম)
✱ সন্তানকে দুধ, ভাত, ইত্যাদি দেওয়া যেমন তাহাদের হক, তেমনই দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা দেওয়াও তাহাদের হক, তাই দুধ না দিয়া সন্তানকে মারিয়া ফেলিলে যেমন তাহার হক নষ্ট হয়। তেমনি দ্বীনি এলেম শিক্ষা না দিলেও তাহার হক নষ্ট করা হয়; এই পাপের চাক্ষষ ফল এই যে, সন্তান বড় হইয়া বাপ মাকে কষ্ট দেয়। না-উযুবিল্লাহ (তিরমিজী)
✱ অভাব গ্রস্থদের অভাব মোচনের জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবে, টাকার দ্বারা না পারিলে একটা কথার দ্বারা সাহায্য করিতে পারিলে তাহাও করিবে–(বোখারী মুসলিম)।
✱ কাহারো কোন দোষ দেখিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। গাহিয়া বেড়াইবেনা– (বোখারী ও মুসলিম)।
✱ কাহাকেও কোন বিপদে দেখিলে প্রাণপনে তাহাকে সাহায্য করিবে–(বোখারী ও মুসলিম)।
✱ কাহাকেও তুচ্ছ মনে করিবেনা, কাহারো জান ও মাল বা ইজ্জত নষ্ট হইতে দেখিলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেনা। যতদুর পারো সহায়তা করিবে।–(মুসলিম)।
✱ যেই রকম ব্যবহার অন্যের নিকট হইতে পাইতে চাও, অন্যের সঙ্গেও তুমি সেইরূপ ব্যবহার কর।– (বোখারী, মুসলিম)।
✱ ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি ভক্তি রাখিবে; বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোককে বেশি ভক্তি করিবে (তিরমিজি)।
✱ কোন ভাইয়ের মধ্যে কোন দোষ দেখিলে চুপে নরমভাবে তাহাকে জানাইয়া দাও; নতুবা অন্যত্র গিয়া শরম পাইবে, অপমান ভোগ করিতে হইবে। (তিরমিযী)
✱ নিজের দোস্ত এবং পথের সঙ্গীদের সহিত যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিবে–(তিরমিযী)।
✱ যাহার যেমন মর্যাদা তাহাকে তেমন সম্মান করিবে, সকালের সহিত এক রকম ব্যবহার করিবেনা–(আবূ দাউদ)।
✱ তুমি পেট ভরিয়া খাইতে থাক, আর তোমার প্রতিবেশি উপবাস করিয়া থাকে, ইহা বড়ই নিষ্ঠুরতা– (বায়হাকী)।
✱ স্বার্থের জন্য দোস্তি মোহাব্বাত করা ভাল নয়। কাহারো সহিত দোস্তি মোহাব্বাত করিতে হইলে নিঃস্বার্থভাবে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে করবে–(মুসলিম)।
✱ যাহার সহিত দোস্তি মোহাব্বত করিতে হয়, আগে তাহার আমল আখ্‌লাক ভালমত দেখিয়া লইবে, নতুবা দোস্তের তাছিবে তুমিইও হয়ত খারাপ হইয়া যাইতে পার– (আহমদ, তিরমিযী)।
✱ কাহারো সম্বন্ধে খারাপ ধারণা রাখিওনা। কাহারো সহিত হিংসা বিদ্বেষ বা শত্রুতা করিওনা। ফলকথা, এই যে, সকলেই আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হইয়া জীবন–জাপন কর–(বোখারী, মুসলিম)।
✱ তোমার কাছে কেহ কোন বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে বাস্তবিকই তোমার যাহা ভাল মনে হয়, তাহা বলিবে।–(তিরমিযী)।

✱ হিসাব করিয়া খরচ করিবে। লোক সমাজে অপ্রিয় হইতে হয় এমোন কোন ব্যবহার করিবেনা। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে–(বায়হাকী)।

✱ লোকের সহিত নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করিবে–(মুসলিম)।

✱ লোক সমাজে মিলিয়া তাহাদের উপকার করা এবং কষ্ট সহ্য করা, নিজে কোথায় বসিয়া শান্তিতে থাকা অপেক্ষা ভাল; হ্যাঁ, যদি একান্ত অসহ্য হয়, তবে সে ভিন্ন কথা–(তিরমিযী)।

✱ দেনা–পাওনা, দাবী–দাওয়া মাফ করাইয়া রাখিবে; নতুবা ক্বিয়ামতের দিন বড়ই মুছিবতে পড়িতে হইবে। (বোখারী)।

"ইসলামী জীবন পরিচালনায় মাজহাবের প্রয়োজনীয়তা ও না মানার পরিনাম"

মাহমুদুল হাসান নাঈম,
নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, সিরাজগঞ্জ।

সকল প্রশংসা সেই সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই দাসত্ব করার জন্য। আর প্রেরণ করেছেন তার মনোনীত রাসূল (সঃ) কে মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্যে এবং মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে অনুসরণ করার জন্যে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে দীক্ষা দেয়ার জন্যে নাযিল করেছেন ৬৬৬৬ আয়াত। যার সমষ্টিই দ্বীন–ই–ইসলামের প্রথম উৎস আল–কোরআন। আর যার উপর নাযিল হয়েছে এই পবিত্র কোরআন তার সকল কাজই ইসলামী জীবনের বাস্তবরূপ। তাই তার কথা কাজ মৌন সম্মতিই ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস- আল হাদীস। আর বিশ্বনবী রেখে যাওয়া এই দুই সম্পত্তির প্রথম ধারক বাহক ছিলেন সাহাবীরা তারপর তাবেয়ীনরা তারপর তাবে তাবেয়ীনরা ও ইমাম মুজতাহিদগণ ইসলামী শরীয়ার কোন বিষয়ে তাদের সমন্বিত সিদ্ধান্ত "ইজমাহ" হল ইসলামী শরীয়ার তৃতীয় উৎস। এই তিনটির মধ্যে কোন বিষয়ে স্পষ্ট সমাধান খুঁজে না পাওয়া গেলে মুজতাহিদগণের দায়িত্বশীল ভিত্তিক প্রমাণিত সদৃশ বিষয়ের সাথে তুলনা করে বিধান বা মাসআলা প্রদান করা যা "কিয়াস"। এটা ইসলাম শরীয়ার ৪র্থ ভিত্তি। ইসলামী শরীয়ার মূলভিত্তি চারটি। ---------- এই চারটি মূলভিত্তির উপর ভর করে দৈনিন্দন জীবনের যে কোন ধরনের সমস্যার ইসলামী সমাধানই হল "ফিক্বাহ"।

আল্লাহর রসূল (সঃ) ঘোষিত কল্যানময় তিন যুগ ও নিকটবর্তী সময়ে উল্লেখিত চারটি মূলনীতির উপর ভর করে মাসআলা–মাসায়েল প্রদান ও পর্যায়ক্রমে গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। যাতে করে কম বুঝও ইলমওয়ালা মানুষগণ সহজে আল্লাহ তার রসূল (সঃ) এর প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করতে পারে। সাগর সেচে মুক্তা আনারমত বিশাল কাজটি যে সকল মহান বক্তিগণ আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে সাহাবাদের থেকে হযরত আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুযাজ ইবনে জাবাল, আয়েশা, মুযাবিয়া, আমর ইবনুল আসও মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) অন্যতম এবং সাহাবী পরবতী ইমাম হাসান বসরী, আবু হানিফা, শাফেরী, মালেক, আহমদ, ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, সুফিয়ান সাওরী, আবু ইউসুফ, মুহম্মদ (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) প্রথম ফিক্বাহকে সংকলিত করেন। পরবর্তীতে অনেক ফিক্বাহ সংকলিত হলেও শুধুমাত্র চারটি ফিক্বাহই যথাযথভাবে সংরক্ষিত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। সেহেতু ইসলামী জীবন পরিচালনার জন্য চারটি মাজহাব বা পথ প্রতিষ্ঠিত। ফিক্বহ সংকলিত হওয়ার পর থেকে ইসলামী বিশ্বে সকল যুগের মুফতি, মুফাচ্ছির, মুহাদ্দেস প্রায় সকলেই যে কোন একটি মাজহাব অনুসরণ করে আসছেন। আর এই অনুসরণকেই তাকলীদ বলা হয়।

অধুনা কিছু স্বঘোষিত দায়ী বা ইসলাম প্রচারক আল্লাহর রাসূল (সঃ) সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে–তাবেয়ীগণের রেখে যাওয়া নির্ভেজাল, নিষ্কলুষ ইসলাম ভেজাল সমেত স্বীয় মত ও ব্যাখ্যা অনু প্রবেশ করানোও ইসলামী বিশ্বে বিভেদের বিষবাষ্প ছড়ানোর লক্ষ্যে মাজহাব বিরোধী প্রচারণা তুঙ্গে তুলে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। সময়ের দাবিতেই কলম ধরতে বাধ্য হলাম। তাই মাজহাবের পরিচয়, কোরআন হাদীস মতে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে ও না মানার পরিনাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।(ইনশাআলল্লাহ)

এ কথা অনস্বীকার্য যে দ্বীন ও শরীয়াতের ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহও রাসূলেরই অনুগত্য করে যেতে হবে সমর্পিত চিত্তে, এখলাস ও একনিষ্ঠার সাথে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গকে এ আনুগত্যের সামান্যতম হকদার মনে করারই অপর নাম হল শিরক। অন্য কথায় হালাল–হারামসহ শরীয়তের যাবতীয় আহকাম ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ ই মাপকাঠি। আর এ দুইয়ের একক অনুগত্য হল ঈমান ও তাওহীদের দাবি। এ বিষয়ে ভিন্ন মতের কোন অবকাশ নেই। তবে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত আহকাম দু ধরনের।
১। কিছু আয়াত বা হাদীস রয়েছে যা স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ততা ও বাহ্য বিরোধমুক্ত।
২। কিছু আয়াত বা হাদীস রয়েছে যা অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত বা বাহ্য বিরোধমুক্ত।
প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে, আয়াতগুলোর উদ্দেশ্যে ও মর্ম স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হওয়ায় বিশিষ্ট কিংবা সাধারণ সকলের ক্ষেত্রে অর্থ থেকেই হুকুম বুঝা সম্ভব।
যেমন আল কোরআনের বাণী–
ওহে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য রোযাকে ফরজ করা হয়েছে যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকার–১৮৩)
এখানে রোজার ফরজিয়াত আরবী শিক্ষিত যে কোন ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট।
যেমন হাদীসের বাণী---------- হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত। তা হল এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া (যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, যথার্থভাবে নামায আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং রমজান মাসে রোযা পালন করা। (বোখারী ও মুসলিম)
১। ইমাম বুখারী আসসহীহ, রিয়াদঃ দারুস সালাম লন নাশর ওয়াত তাওযী, মার্চ ১৯৯৯ হাদীস নং ৮ পৃঃ ৫ ইমাম মুসলিম আসসহীহ।
রিয়াদঃ দারুস সালাম লিন নাশর ওয়াত তাওযী, জুলাই ১৯৯৮ হাদীস নং ১১৪ পৃঃ ২৯।
উদৃত হাদীস থেকেও ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তি বা পাঁচটি মৌলিক ফরজ কাজ বুঝতে কোন সমস্যা হয় না।
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার তথা যে আয়াত বা হাদীস অস্পষ্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত কিংবা বাহ্য বিরোধযুক্ত সেগুলোর সংখ্যা ও কোরআন ও হাদীসে কম নয়। সংক্ষিপ্ত ও দ্ব্যর্থবোধক উপস্থাপনা কিংবা আয়াত ও হাদীসের দৃশ্যতঃ বৈপরীত্যের কারণে এ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।
যেমন কোরআন কারীমে ইরশাদ–---------- তালাক প্রাপ্তরা তিন কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।
তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দতের সময়সীমা নির্দেশ প্রসংগে এখানে ----(কুরব) শব্দটির ব্যবহার এসেছে। কিন্তু মুশকিল হল; আরবী ভাষায়, হায়েয (স্ত্রী লোকের মাসিক ঋতুস্রাব) ও তুহুর (দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়) উভয় অর্থেই আলোচ্য শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। সুতরাং প্রথম অর্থে ইদ্দতের সীমা হবে তিন হায়েয। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে সে সময়সীমা দাড়াবে তিন তোহর। বলাবাহুল্য যে, ---- শব্দের দ্ব্যর্থতাই এ জটিলতার কারণ। কিন্তু প্রশ্ন হল; এ দুই বিপরীত অর্থের কোনটি আমরা উম্মি লোকরা গ্রহণ করবো?
তদ্রূপ আরেকটি উদাহরণ হল–
নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন–
(পাঁচজন সাহাবী (সঃ) রেওয়াত করেন)---------- যে লোক মুক্তাদী হয়ে নামাজ পড়ে, ইমামের কেরাতই তার জন্য যথেষ্ট–
এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরাত কিছুতেই চলবে না।
অথচ অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে–---------- "সূরাতুল ফাতিহা যে পড়েনি তার নামাজ শুদ্ধ হয়নি" এ হাদীসের আলোকে ইমাম মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক।
হাদীসদ্বয়ের এ দৃশ্যত বিরোধ নিরসন কল্পে প্রথম হাদীসকে মূল ধরে দ্বীতিয়টির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, এ হাদীসের লক্ষ ইমাম ও মুনফারিদ (একা একা নামাজ আদায়কারী), মুক্তাদি নয়। সুতরাং

ইমাম ও মুনফারিদের জন্য সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও মুক্তাদির জন্য তা নিষিদ্ধ। কেননা ইমামের কিরাত মুক্তাদির কিরাত বলে গণ্য হবে।
১। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮৫০, মুসনাদে আহমাদ খ. ৩, পৃঃ ৩৩৯ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক–২৭৯৭০, সুনানে বায়হাকী খ. ২, পৃ: ১৬০ তোহফায়ে আহলে হাদীস– পৃঃ– ৭৭ তোহফায়ে আহলে হাদীস– পৃঃ ৭৭
২। বোখারী শরীফ
আবার দ্বিতীয় হাদীস মূল ধরে প্রথমটির এরূপ ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এখানে এর অর্থ হল সূরাতুল ফাতিহার সাথে অন্য সূরা যোগ করা। (দ্বিতীয় হাদীসের আলোকে (ইমাম মুনফারিদ ও মুক্তাদি) সবার জন্য সূরাতুল ফাতিহা বাধ্যতামূলক হলেও অন্য সূরা যোগ করার ক্ষেত্রে মুক্তাদির জন্য ইমামের ক্বিরাতই যথেষ্ট।
এখন প্রশ্ন হল এ দুটির মধ্যে কোনটি আমি গ্রহণ করব? কোন যুক্তিতে একটি ব্যাখ্যা পাশ কেটে অন্যটি প্রধান্য দিব? কোরআন সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলে সমাধান কল্পে আমরা দুটি পন্থা অবলম্বন করতে পারি। অর্থাৎ নিজের জ্ঞান-প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা প্রথম জামানার মহান পূর্বসূরীদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ।
ইনসাফের দৃষ্টিতে আমাদের দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা এই যে, প্রথম পন্থাটি অত্যন্ত ঝুকিবহুল ও বিপদ সংকুল।
পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি বাস্তব সম্মত ও নিরাপদ। এটা অতিরিক্ত বিনয় কিংবা হীনমন্যতা নয়; বাস্তব সত্যের অকুণ্ঠ সত্য মাত্র। কেননা ইলম, হিকমত, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, মেধা ও স্মৃতিশক্তি, ন্যায় ও ধার্মিকতা এবং তাকওয়া ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে দৈন্য ও নিঃর্শ্বতা এতই প্রকট যে, খয়রুল কুরুন তথা তিন কল্যাণ যুগের আলিম ও ওয়ারিসে নবীগণের সাথে নিজেদের তুলনা করতে যাওয়া তো এক নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া কিছু নয়। তদুপরি খয়রুল কুরুণের মহান আলেমগণ ছিলেন পবিত্র কোরআন অবতরণের সময় ও পরিবেশের নিকট প্রতিবেশী। এ নৈকট্যের সুবাদে কোরআন সুন্নাহর মর্ম অনুধাবন ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ তাদের জন্য ছিল সহজ ও স্বচ্ছন্দপূর্ণ। পক্ষান্তরে নবুওতের এক–দেড় হাজার বছর পর আমরা এসেছি তাই কোরআন সুন্নাহর পটভূমি, পরিবেশ এবং সে যুগের সামাজিক রীতি–নীতি, আচার–আচরণ ও বাকধারা সম্পর্কে নিযুক্ত। নির্ভুল ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব না হলে কষ্ট সাধ্য এবং পদস্খলনের আশংকাপূর্ণ অবশ্যই। অথচ সঠিক অনুধাবনের জন্য এটা অপরিহার্য।
এ সকল কারণে জটিল সূক্ষ্ম আহকামের ক্ষেত্রে নিজেদের অপরিপক্ক ইলম ও প্রজ্ঞার উপর ভরসা না করে খয়রুল কুরুনের মহান পূর্বসূরী আলেমদের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করাই হল নিরাপদ ও যুক্তি সংগত। এ যৌক্তিক ও আবশ্যিক বিষয়টি বলা হয় তাকলিদ করা বা মাজহাব মানা।
১। তর্কের খাতিরে যদি বলি
আর যৌক্তিক বিষয়টি আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের নির্দেশের কারণেই মাননীয় ও অনুসরণীয়।
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন–---------- অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)এর আনুগত্য কর আর তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদেরও অনুসরণ কর।
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত -------- এর আসল মর্ম হল "আলেম ও ফকিহগণ"। নিচে ----- এর মর্ম সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বক্তব্য তুলে ধরা হল–
প্রখ্যাত সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন,---------- অর্থাৎ উলীল আমর দ্বারা ফকীহ ও সৎলোক উদ্দেশ্য
রইসূল মুফাচ্ছিরীণ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন–---------- অর্থাৎ "উলীল আমর" দ্বারা আহলে ফিক্বহ ও তাদের অনুগত্যকে জরুরী করেছেন।
১। মুসতাদরাকে হাকেম ১:১২৩, কুরআন হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ পৃঃ–১৭
২। প্রাগুক্ত

ঠিক একই তাফসীর হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হযরত আতাবিন সায়িব (রহঃ), হযরত আতাবিন আবী রাবাহ (রহঃ) হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হযরত আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
ইমাম রাযী (রহঃ) এ তাফসীরটিকেই বিভিন্ন প্রমাণের আলোকে প্রধান্য দিতে গিয়ে লিখেন–------ ---------- অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে উলীল আমর দ্বারা উলামায়ে কিরাম উদ্দেশ্য।
পাঠক! একবার ভেবে দেখুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলেম ও ফক্বীহদের অনুসরণ করা আবশ্যক করেছেন। আর আলেম ও ফক্বীহদের মধ্যে ইলম, আমল ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হযরত ইমাম মালিক (রহঃ), হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) কি শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটধারীদের অন্যতম নন? কোরআন হাদীস থেকে তাদের উদ্ভাবিত ও সমাধিত মাসআলার চেয়ে কার দেয়া ফতুয়ার উপর অধিক ভরসা রাখা যায়? ভরসা রাখা যায় কি ঐ সকল টিভি উপস্থাপকদের ফতুয়ায় যারাই "পুরুষ মহিলার আবাধ মিশ্রণে ইসলামী জলসা, সেমিনারের মত ডিজিটাল বেদায়াতের সৃষ্টিকারী?
১। তাফসীরে কাবীরঃ ১০: ১৪৫
সম্মানিত পাঠক। পৃথিবীর সকল সংগঠন প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র পরিচালনার যেমন এক একটি সংবিধান থাকে তেমনি মানব জীবন পরিচালনারও একটি সংবিধান রয়েছে। তা হলো পবিত্র আল কোরআন। আবার সংবিধান ব্যাখ্যারও একটি মূলনীতি থাকে অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিই সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার রাখেন না আর যারাও রাখেন তারাও নির্দিষ্ট ছকে রাখেন। একইভাবে (যৌক্তিকভাবেই) কোরআন ব্যাখ্যা করার মূলনীতি, হাদীস গ্রহণ করা, মানা আমল করার কিছু মূলনীতি রয়েছে তেমনি কোরআন হাদীস থেকে মাসআলা গ্রহণের ও মূলনীতি রয়েছে। স্ব–স্ব স্থানে প্রত্যেকটি আবশ্যক। মজার বিষয় হল তথাকথিত আহলে হাদীস ভাইয়েরা হাদীসের মূলনীতির (উসূলের) প্রতি গুরুত্বারোপ করলেও এ থেকে কিভাবে আমল করা যাবে, বাহ্যিক দ্বন্দ্ব কিভাবে সমাধান করা যাবে, কোনটাকে তারযি করা যাবে বা যাবে না ফিক্বাহের এ মূলনীতির ব্যাপারে তারা একান্ত স্বেচ্ছাচারী। যা কোরআন নিষিদ্ধ মনোবৃত্তির পূজার সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর সকলেই যদি তাদের এই স্বেচ্ছাচারী মূলনীতি গ্রহণ করে তাহলে পৃথিবীতে ইসলামের যে রূপ দেখা যাবে তা কল্পনা করিতে শিউরে উঠতে হয়। আল্লাহ আ'লম। সম্মানিত পাঠক! এবার কল্পনা নয় বাস্তবে তাদের স্বেচ্ছাচারী নীতির কয়েকটি পরিণতি। আমার ক্ষুদ্র গবেষণার যা বেরিয়ে এসেছে তা একবাক্যে ভয়াবহ। যদি আমাদের মূলনীতি তথা কোরআন ও হাদীস মানব সাহাবী তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীন ইমাম মুজতাহিদদের প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত আহলে হাদীসদের মত 'সহীহ হাদীস যেমন পাব তেমন মানব (হোক মানসুখ) এবং ব্যাখ্যা নিজের বিবেকের কাছ থেকে নেব।" মূলনীতি (স্বেচ্ছাচারী) গ্রহণ করা হয় তাহলে বিপত্তির শেষ নেই। যার স্বীকার আহলে হাদীসরা নিজেরা এবং তাদের মূলনীতি গ্রহণকারী কাদিয়ানী মাজার পূজারীরা। নিচে কয়েকটি উপমা উল্লেখ করা হল–
এক আল্লাহর রাসূল (স:) এরশাদ করেন ---------- উল্লেখ্য এখানে ----------(খতম) শব্দের দুটি অর্থ অভিধানে বিদ্যমান– একটি শেষ অন্যটি আংটি। এখানে প্রথম অর্থটি নিলে বাক্যের অর্থ দাড়াবে–
আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না। আর ২য় অর্থ গ্রহণ করলে "আমি আংটিধারী নবী, আমার পরে কোন (আংটিধারী) নবী আসবে না"। (নাউজুবিল্লাহ) এখানে অর্থ গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা থাকলে মুহূর্তেই ঈমান বিষন্নীভূত হয়ে যেতে পারে। যেমনটি কাদিয়ানীদের হয়েছে।
তারা ---------(খতম) এর প্রথম অর্থটিকে নিজেদের প্রয়োজনমত উপেক্ষা করে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছে যে ব্যাখ্যা পূর্ব জমানার কোন আলেমই প্রদান করেননি। অর্থাৎ তারা বেদয়াতী মতবাদ শুরু করল এই যে, মুহাম্মদ (সঃ) শেষ নবী নয় বরং সবচেয়ে সম্মানিত নবী, আংটি তার বিশেষ বিশেষত্ব ছিল এবং তারপরও নবী (ছায়া নবী) আসবেন। ঈমান অবশিষ্ট থাকল কি? এভাবে লামাযহাবী মতবাদের মাধ্যমে সকল শব্দের ব্যাখ্যা করলে কি পরিণতি হতে পারে? পাঠকের কাছে গবেষণার দাবি রইল।

দুই যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন–---------- আল্লাহ তাদের (সাহাবীদের উপর) সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এছাড়া অসংখ্য হাদীসে রসূল (সঃ) এ সাহাবীদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। হাদীসের বাণী–---------- ---------- "আমার সাহাবাগণ তারকাতুল্য। তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে"

তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মৌলিক বিশ্বাস এই যে, "সকল সাহাবী ন্যায় পরায়ন এবং হক্কের মাপকাঠি তাদের এখলাস ও আমল প্রশ্নাতীত।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত আহলে হাদীস দাবিদাররা তাদের স্বেচ্ছাচারী নীতির উপর ভর করে নিষ্কলুষ সাহাবী (রাঃ) জীবন–চরিত্রে কালিমা লেপনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। (নাউজুবিল্লাহ) আহলে হাদীসদের কিতাবে লিখা আছে–---------- ---------- "এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সাহবাদের মাঝে যারা ফাসিক ছিল, যেমন ওনীদ বিন উকাবা (রা:) এমনই বলা যায় মুযাবিয়া (রা:) আমর বিন আস (রা:) মুগীরা বিন শুবা (রা:) এবং সামুরা বিন জুনদুব (রা:) ব্যাপারে।

সাহাবী (রাঃ) ফাসেক বলে শিয়া এবং আহলে হাদীসের মধ্য পার্থক্য কি থাকল?

প্রশ্ন হল আল্লাহর রসূল (স:) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কিতাব এবং নিজের জীবন–কর্ম যাদের কাছে রেখে গেল সেই বাহকগণকে ফাসেক বললে– কুরআন হাদীসের উপর প্রশ্ন তোলা হয় কিনা? আর কোরআন হাদীসের উপর প্রশ্ন তুললে নিজের ঈমান কোন দরজায় গিয়ে পৌঁছে?

বিজ্ঞ পাঠকের কাছে আবারও ভাবনা ও গবেষণার দাবি রইল।

১। নুজুলুল আবরার–২/৯৪।

সর্বপরি আল্লাহর কাছে একান্ত ফরিয়াদ–আল্লাহ আমাদেরকে এই নব্য ফেততা আহলে হাদীস নামবীরীদের ধোকা থেকে হেফাজত করুন। আমাদেরকে নবীয়্যিন, সিদ্দিকীন, শোহাদা ও সলেহীনদের পথে পরিচালিত করুন। (আমীন)

ব্রিটিশ গোয়েন্দার জবানবন্দি

১

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা:

এ ধারাবাহিক ইতিহাসটি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োজিত হ্যামফার নামক এক গোয়েন্দার ডায়রির অনুবাদ। হ্যামফারের ডায়রিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে এবং তাহা জার্মান পত্রিকা 'ইসপিগল'– ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তখন থেকেই বিষয়টি জনসমক্ষে চলে আসে।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) মদিনাতে ইসলামি খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা ১৯২৪ সনের ৩ মার্চ প্রায় সাড়ে তেরশত বছর টিকে ছিল। সর্বশেষ খিলাফতের রাজধানী ছিল তুরস্কে। শেষের দিকে ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে মুসলমানদের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা শুরু হয়। খিলাফতের শাসন আমলে ১৭ শতকের গোড়ার দিকের কিছু ঘটনা এ ডায়রির প্রতিপাদ্য বিষয়। পবিত্র কুরআনুল করিম–এর সূরা–আল মাঈদা'র ৫১ আয়াতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন যে, "ইহুদী এবং মুশরেকরা কখনো তোমাদের বন্ধু হতে পারে না।" প্রথম থেকেই তারা ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করে আসছে, এ ধারাবাহিকটি তার একটি উদাহরণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে সম্পদ লুণ্ঠন করে করে ধনী হওয়াই ব্রিটিশদের রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তি। ইসলামের ন্যায়পরায়নতা ব্রিটিশদের দস্যুবৃত্ততা এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য নানা ফন্দি–ফিকির খুঁজতে থাকে এবং এ লক্ষ্যে তারা লন্ডনে কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় তৈরি করে। তারা এ মন্ত্রণালয় থেকে হাজার হাজার

গোয়েন্দা বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাঠায়, মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে। হ্যামফার হচ্ছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের একজন গোয়েন্দা। তাকে মিসর, ইরান, ইরাক, হিজাজ এবং ইসলামের খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করা এবং খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করার জন্য নিয়োজিত করে। সে নাজাদের মোহাম্মদ নামক এক মুসলিম যুবক'কে ফাঁদে ফেলে এবং কয়েক বছর তাকে ভ্রান্ত পথে চালিত করে, তারই ফলশ্রুতিতে তারা ১১২৫ হিজরীতে (১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ) একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১১৫০ হিজরীতে তারা ওহাবিয়া সম্প্রদায়ের কথা ঘোষণা করে। আজও ইহুদী খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমানদের দূর্বল করার জন্য বিভিন্ন দলে বা গ্রুপে বিভক্ত করতে চেষ্টা করছে। তারা ইরাকে মুসলমানদের ভূমি দখল করা ছাড়াও শিয়া সুন্নি বিভেদ উস্কে দিচ্ছে। আমাদের দেশে কাদিয়ানী নামে আর একটি সম্প্রদায় দাড় করানোর জন্য মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা এ বইটি অনুবাদ করেছি এ কারণে যে, মুসলমানদের কিভাবে পতন শুরু হয়েছিল সে বিষয়টি যেন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং শত্রুদের চিনতে পারেন তাহলে তাদের পুনঃজাগরনের সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আজও ইসলামের শত্রুরা কিভাবে কাজ করছে তাও তারা বুঝতে পারবেন।

তুরস্কে HAKIKAT KITABEVI প্রকাশনী মূল ডায়রির সাথে প্রয়োজনীয় টাকা এবং ক্ষেত্র বিশেষে কিছু সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। আমরা সে বইটির ইংরেজি ভার্সন থেকে কেবলমাত্র ডায়রির অংশটি (কিছু টিকাসহ) ধারাবাহিক ভাবে অনুবাদ প্রকাশ করেছি। বইটি আরো কিছু তথ্যে সমৃদ্ধ। ইংরেজি বইটি http://www.hakikatkitabevi.com Confessions of a British Spy নামে পাওয়া যাবে। এ ধারাবাহিকটি পড়লে দৃঢ় আশা রাখি সম্মানিত পাঠকদের অনুভূতি জাগ্রত হবে, ইসলামকে ধ্বংস করতে ইহাহুদী, খ্রীষ্টান, নাস্তিকরা কত বদ্ধপরিকর এবং ইসলামকে ধ্বংস করতে কত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার নীল নকশা একেছিল তা তাদের উত্তরসূরীরা কত সূক্ষ্মভাবে যুগে যুগে বাস্তবায়ন করেছে আজও করে চলছে। নিজেদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ থাকলেও ইসলামী ধ্বংসের হিংস্র মিশনে তারা একতাবদ্ধ। তাদের পরিকল্পিত ফাঁদে পা দিয়ে মুসলিমরা আজ বহু দল, উপ-দলে বিভক্ত যার জন্ম ইতিহাস ভয়াবহ। হাজারো দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে ওহাবী মতবাদের জন্ম ইতিহাস বৃটিশদের নিয়োজিত গোয়েন্দার জবানবন্দিতে তার লিখিত ডায়েরী থেকে আমরা বাংলা ভাষায় ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করি, ওহাবী মতবাদের ভয়ংকর জন্ম ইতিহাস থেকে মুসলিম সমাজ শিক্ষা নিয়ে বে-দ্বীনের পেতে রাখা ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হবে।

হ্যামফার বলেনঃ

আমাদের ব্রিটেন এক বিশাল দেশ। এ দেশের সাগরের উপর সূর্য উদয় হয় এবং আবার এই সাগরের অতলে সূর্য অস্ত যায়। তারপরেও আমাদের কলোনী ভারত, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যে এখনও অনেক দুর্বল। এ রাষ্ট্রগুলো এখন পরিপূর্ণভাবে আমাদের করায়াত্ত নয়। এ দেশগুলোর ব্যাপারে আমরা স্বক্রিয় এবং ও সফল পরিকল্পনার গ্রহণ করেছি। আমরা অবিলম্বে এ সকল দেশগুলোতে সম্পূর্ণ দখলদারী স্থাপন করতে পারব। এ জন্য আমাদের দুটি বিষয় অতীব জরুরীঃ–

১। আমরা যে স্থান দখল করেছি তা ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২। যে সকল স্থানে দখলদারিত্ব নাই তা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয় উপরোক্ত প্রত্যেক কলোনী রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এ কাজ দুটি করার জন্য কমশিন গঠন করেছে। আমি কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার সাথে সাথেই মন্ত্রীমহোদয় এ কাজের জন্য আমার উপর আস্থা স্থাপন করেন এবং আমাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক নিযুক্ত করেন। বাহ্যিকভাবে এটা ছিল একটা বাণিজ্যিক কোম্পানি কিন্তু এর প্রকৃত কাজ ছিল বিশাল ভারতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পন্থা খুঁজে দেখা।

আমাদের সরকার ভারতের বিষয়ে ভীত ছিল না। ভারত হচ্ছে বহুজাতিক লোকের দেশ, এখানে মানুষেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং পরস্পরবিরোধী স্বার্থের লোক বাস করে। আমরা চীনের বিষয়েও ভীত নই। চীনে বৌদ্ধ ও কনফিউসিয়ান ধর্মের লোকেরা বাস করে, এর কোনটাই আমাদের জন্য বড় বাঁধা নয়। দুটো ধর্মই মৃতপ্রায় এবং জীবন ঘনিষ্ঠ নয় এবং কেবল কোন ধর্মাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। আর এ কারণেই এ দুই দেশের লোকদের দেশপ্রেমের অনুভূতি খুবই কম। এ দুটি দেশ আমাদের ব্রিটিশ সরকারের কোন চিন্তার বিষয় নহে। কথা হচ্ছে, দেরিতে হলেও এ দুটি দেশ জয় করার কথা বিবেচনা থেকে বাদ দিলে চলবে না। তাই আমরা এ দুটি দেশে বেতন বা মজুরী নিয়ে সংঘাত, অজ্ঞতা, দারিদ্রতা ও রোগব্যাধি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ দুটি দেশের প্রথা এবং নিয়ম–কানুন নকল ও অনুকরণ করতে শুরু করি।

অবশ্য ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপারে আমাদের ভয় ছিল। আমরা আমাদের স্বার্থের অনুকূলে সিকম্যান (অটোম্যান সম্রাট)–এর সাথে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। কমনওয়েলথ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞ সদস্যদের অভিমত যে সিকম্যান এ শতাব্দীতেই শেষ হয়ে যাবে। অধিকন্তু আমরা ইরানী সরকারের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত গোপন চুক্তি সম্পাদন করেছি এবং এ দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের আমরা রাজমিস্ত্রির মতো বসিয়ে রেখেছি। এ দুটি জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দেয়ার জন্য তাদের ঘুষ প্রদান করে দুর্নীতিগ্রস্থ করা, অযোগ্য প্রশাসন তৈরি করা, অপর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষা এবং সুন্দরী রমনীদের দ্বারা ব্যস্ত রেখে তাদের দায়িত্বে অবহেলা তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত কিছু সত্ত্বেও আমরা আমাদের কর্মের আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলাম না বলে উদ্বিগ্ন ছিলাম। ফল না পাওয়ার কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করছি।

১। মুসলমানরা একান্তভাবেই ধর্মভীরু। খুব বাড়িয়ে না বললেও বলা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানই একজন পাদ্রীর বা সন্যাসীর মতো দৃঢ়ভাবে ইসলামের সাথে জড়িত। জানা যায় যে একজন পাদ্রীর বা সন্নাসী মৃত্যুবরণ করবে তবু খ্রিস্টান ধর্মকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়।

২। ইসলাম ছিল কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার ধর্ম এবং মুসলমানরা ছিল সম্মানিত। এখন এ সম্মানিত জনগণকে একথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, যে তারা আজ দাসে পরিণত হয়েছে। তা নাহলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এমন মিথ্যাচার করাও সম্ভবপর হতো না এবং তাদের এমনভাবে বলা যেত না যে একদা তোমরা যে সম্মান এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলে তা ছিল কতগুলো অনুকূল পরিবেশের ফসল। সে দিনগুলো অতীত হয়ে গেছে এবং তা আর কখনও ফিরে আসবেনা।

৩। আমরা অতীব উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলাম যে অটোম্যানরা এবং ইরানীরা আমাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারবে এবং বানচাল করে দিবে। তা সত্ত্বেও, বাস্তবতা হচ্ছে এ দুটি রাষ্ট্র বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পরছে, তারপরও আমরা নিশ্চিত নই কারণ তাদের সম্পদ, যুদ্ধাস্ত্র এবং কর্তৃত্বসহ একটি কেন্দ্রীয় সরকার তখনো বর্তমান আছে।

৪। আমরা ইসলামী মনীষীদের ব্যাপারে চরম দুশ্চিন্তায় আছি। কারন ইস্তাম্বুল, আল আজহার, ইরাক এবং দামেস্কের পন্ডিতরা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে বড় বাধা। তারা জনগণের প্রতি দয়ালু, তাঁরা তাঁদের নীতি এবং আদর্শের সাথে সামান্যতম আপোষ করে না। কারণ তাঁরা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে তারা করআনুল কারিমের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। জনগণও তাঁদেরকে অনুসরণ করছে। এমনকি সুলতানও তাঁদেরকে সমীহ করেন। সুন্নিরা শিয়াদেরমতো তাদের পন্ডিতদের অন্ধভাবে অনুগত নয়। শিয়ারা বইপত্র পড়ে না, তারা শুধুমাত্র পন্ডিতদের মান্য করে এবং তারা তাদের সুলতানের প্রতিও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে না। অপরপক্ষে সুন্নিরা বই–পুস্তক পড়াশুনা করে এবং পন্ডিত ও সুলতানকে সম্মান করে।

এরপর আমরা অনেকগুলো সম্মেলন করেছি। আমরা ক্লান্ত হয়ে পরতাম এবং প্রতি বার হতাশ হয়ে দেখতাম যে আমাদের জন্য সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের গুপ্তচরদের নিকট থেকে যে তথ্য পেতাম তা ছিল হতাশাব্যাঞ্জক এবং সম্মেলনের ফলাফল হতো শূন্য। তবুও আমরা এ বিষয়ে আশা ত্যাগ করিনি। কারণ আমরা এমন এক শ্রেণির লোক যারা, ধৈর্যের সাথে গাঢ় নিশ্বাস নেয়ার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছি।

এক সম্মেলনে সর্বোচ্চ নির্দেশদাতা মন্ত্রী নিজেই এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। আমরা ছিলাম বিশজন। আমাদের সম্মেলন তিন ঘন্টা ধরে চলল এবং ফলপ্রসূ কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চূড়ান্ত অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তথাপি একজন পাদ্রী বলল "চিন্তা করো না। ঈসা এবং তার অনুসারীরা তিনশত বছর নির্যাতিত হওয়ার পরে কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। এটা আশা করা যায় যে, অজানা বিশ্ব থেকে তিনি আমাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন এবং অবিশ্বাসীদের (তার মতে মুসলমান ঝুঝান হয়েছে), তাদের কেন্দ্র থেকে উৎখাত করার জন্য আমাদের সৌভাগ্য দান করবেন। হতে পারে তাতে তিনশত বছর দেরি (খ্রীস্টানদের বিশ্বাষ মতে)। দীর্ঘ মেয়াদী ধৈর্য এবং দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমরা আমাদেরকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করব। কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি গ্রহণ করে আমরা সকল প্রকার গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখা দখল করব। অবশ্যই আমরা মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা হবে সহায়ক, হতে পারে এর জন্য শতাব্দি বছর দরকার হবে। পিতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানের জন্য কাজ করা।

একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তাতে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং এমনকি ইংল্যান্ড থেকে কূটনীতিক ও ধর্মীয় লোকজনেরা উপস্থিত ছিল। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে আমিও ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে পেরেছিলাম। তার কারণ মন্ত্রী সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। সম্মেলনে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা, তাদেরকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরিয়ে ফেলা এবং স্পেনের মতো তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তথাপি সম্মেলনের উপসংহার যেরূপ আশা করা হয়েছে সেভাবে হয়নি। আমি সম্মেলনে আলোচ্য সকল বিষয় আমার "লা মালাকুত–ইল–মসিহ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

মাটির গভীরে প্রথিত যে বৃক্ষের শিকর, তাকে হঠাৎ করে উপড়ে ফেলা কষ্টকর। কিন্তু এগুলো সহজ করা এবং অতিক্রমের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ব্যাপক কষ্ট করতে হবে। খ্রিস্টধর্ম এখন সম্প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের প্রভু ঈসা আমাদেরকে এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু খারাপ অবস্থা হচ্ছে যে পূর্ব এবং পশ্চিমের সকলেই এক সময় মুহাম্মদকে সহায়তা করেছে। কিন্তু সে অবস্থা এখন আর নেই, উৎপাত (তারা ইসলামকে বুঝিয়েছে) দূর হয়েছে। আজকার আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাদের মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য খ্রিস্টান সরকারগুলোর মহান কর্ম এবং চেষ্টার ফলে মুসলমানদের এখন পতন শুরু হয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা কর্তৃত্ব অর্জন করছে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আমরা যে সকল রাষ্ট্রগুলোকে হাত ছাড়া করেছি তা পুনরুদ্ধার করার এটাই সময়। শক্তিশালী রাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এমন এক কাজের (ইসলামকে নির্মূল করতে) জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে। .. .. ..চলবে

সিন্ধু বিজয়

পর্ব–১

জাহেলীয়াতের যুগেও আরবগণ তীর চালনা, অসি যুদ্ধ ও ঘোড়দৌড়ে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জন করাকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য মনে করত। নেতৃত্ব, সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির এটাই ছিল শ্রেষ্ঠ কষ্টি পাথর। মরুবাসীদের সভায় যে কবি তীরের শাঁ শাঁ শব্দ ও অসির ঝর্ণাৎকারকে কল্পনার সাহায্যে সব চাইতে ভালভাবে বর্ণনা করতে পারত, তাকেই শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেওয়া হত। যাকে মরুবাসী তরুণী প্রিয়ার হাসির চেয়ে বিদ্যুৎগতি অশ্ব–ক্ষুরের শব্দ অধিকতর অভিভূত করতো, যার চোখে ধাবমান ও ধূলি–মলিন অশ্বারোহীর ক্ষণিক দৃষ্টি মানসীর অভিসার গতির চেয়ে বেশী কমনীয় প্রতিভাত হত, সেই ছিল লোকপ্রিয় কবি।

আরবদের ব্যক্তিগত বীরত্বকে ইসলাম মুজাহিদ বাহিনীর অজেয় শক্তিতে পরিণত করে। রোম ও ইরানের যুদ্ধ আরবদের যুদ্ধ–বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করে। মহাবীর খালিদের আমলে সারিবন্দী

ও চলাচল ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন প্রচলিত হয়। বর্ম পরিধানের প্রথা আরবদের মধ্যে পূর্বে ছিল কিন্তু রোম যুদ্ধের সময় বর্ম ও শিরস্ত্রাণ জঙ্গী পোশাকের অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়।
দুর্গা প্রাচীর রক্ষিত শহরের অবরোধকালে এমন এক যন্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়, যার দ্বারা প্রস্তত–প্রাচীর চূর্ণ করা সম্ভব। এর থেকে আবিস্কৃত হয় মিনজানীক বা প্রস্তর–নিক্ষেপক যন্ত্র। কাঠের তৈরি এ যন্ত্রের সাহায্যে গুরুভার প্রস্তর খন্ড বেশ দূরে নিক্ষেপ করা হত। হানাদার বাহিনী অবরুদ্ধ দুর্গের বল্লমের পাল্লা থেকে দূরে থেকে এ যন্ত্রের সাহায্যে দূর্গ প্রাচীরের উপর পাথর বর্ষণ সক্ষম হত। ধনুক থেকে এর প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বুদ্ধবিদ্যা বিশারদগণের কয়েক বছরের চেষ্টায় এ যন্ত্রটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রে পরিণত হয়।
দূর্গ রক্ষিত নগর পরাভূত করার জন্য আর একটি যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচলন করেন। এর নাম 'দব্বাবা'। এটা কাষ্ঠ নির্মিত একটি সচল ক্ষুদ্র দূর্গ বিশেষ, যার নীচে চাকা লাগান থাকত। কিছুসংখ্যক সৈনিক শক্ত কাঠের তক্তার আড়ালে আসন নিত এবং অপর কতিপয় সৈনিক তাকে ঠেলে নগর প্রাচীরের সাথে সংলগ্ন করে দিত। পদাতিক সৈন্য সেটার আড়ালে অগ্রসর হত এবং সেটার সাহায্যে নগরপ্রাচীরের উপর আরোহণ করত।
মুক্ত মাঠে পদাতিক সৈন্যের মত আরব অশ্বারোহীগণও প্রথম বল্লমের চেয়ে তলোয়ার ব্যবহারই বেশী অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু বর্ম পরিহিত সৈন্যের বিরুদ্ধে বল্লমের সার্থকতা তারা অচিরেই অনুভব করে। কয়েক বছরের মধ্যে সারা আরবদেশে তীর চালনা ও অসি যুদ্ধের ন্যায় বর্শা নিক্ষেপের প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। রোমের প্রতিবেশী হিসেবে শামের মুসলমানের উপর তাদের প্রভাব বেশি ছিল। সেখানে ধীরে ধীরে বল্লম নিক্ষেপ অসি যুদ্ধের চেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে।
ত্যাজী ঘোড়া এবং আরব অশ্বরোহী সারা দুনিয়ার বিখ্যাত। কাজেই যুদ্ধবিদ্যার অন্যান্য শাখার ন্যায় বল্লম নিক্ষেপেও তারা প্রতিবেশী রাজ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

দুই

দামেস্কের শহরতলীতে এক মুক্ত মাঠে প্রায় প্রতিদিনই বর্শা নিক্ষেপের অনুশীলন চলত। বর্শা নিক্ষেপে গ্রীকদের প্রাচীন প্রথা জনপ্রিয় হচ্ছিল।
বীরত্ব প্রদর্শন প্রার্থী বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী মুখোমুখী হয়ে পরস্পর থেকে একটু দূরে দাঁড়াত। বিপদ আশংকা পরিহার করবার জন্য বর্ম শিরস্ত্রাণ ও চর্তুমুখীর ব্যবহার সত্বেও ভোঁতা বল্লম ব্যবহৃত হত। কিংবা তার ফলা লৌহ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তৈরি হত। সালিস মাঝখানে নিশান লয়ে দাঁড়াত। তার ইঙ্গিতে বিপরীত দিক থেকে অশ্বারোহী পূর্ণ বেগে অশ্ব চালনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করত। যে অশ্বরোহী প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণ এড়িয়ে তাকে আঘাত করতে সক্ষম হত, তাকেই বিজয়ী ঘোষনা করা হত। বিজিত অশ্বরোহী ভোঁতা বল্লমের আঘাতে আহত হত না। কিন্তু অনেক সময় বুকে আঘাতের ফলে বা প্রতিদ্বন্দ্বির বল্লমের চোটে ভারসাম্য হারিয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে দর্শকের হাস্যের খোরাক যোগাত।
অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও প্রদর্শনীতে যোগ দেয়ার জন্য দূর–দূরান্ত থেকে লোক এসেছিল। বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দিকে দর্শকের ভীড় ছিল। ওলীদ ইবন্ আব্দিল মালিক এক কুরসীতে আসীন ছিলেন। তাঁর ডানে বামে দরবারের বড় বড় রাজকর্মচারী বসেছিলেন। অন্যদিকে দর্শক শ্রেণির সম্মুখে সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিক তাঁর নিজস্ব গুণগ্রাহী পরিবেষ্টিত হয়ে আসীন ছিলেন।
প্রদর্শনী শুরু হল। অস্ত্রশস্ত্র বিশেষজ্ঞগণ মিনজানীক ও দর্‌বাবার উন্নততর মডেল পেশ করে পুরস্কার লাভ করলেন। তীরন্দাজ ও অসি যোদ্ধার স্ব স্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের বাহ্‌বা লাভ করলেন।
সুলায়মানের তিনজন সঙ্গী অসি–যুদ্ধ ও তীরন্দাজীতে যোগ দিল। তাদের একজন দ্বিতীয় শ্রেণির শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বলে সাব্যস্ত হল। তার দ্বিতীয় সঙ্গী সালিহ্ অসি–যুদ্ধে পরপর দামিস্কের পাঁচজন বিখ্যাত প্রতিদ্বন্দ্বিকে পরাজিত করে এই প্রতীক্ষায় ছিল যে, খলীফা তাকে ডেকে নিজের পাশে আসন দেবেন। কিন্তু হঠাৎ এক তরুণ ময়দানে এসে তাকে দ্বন্দ্বে আহবান করে বসল। দীর্ঘ এবং প্রবল প্রতিযোগিতার পর সালিহের তলোয়ার কেড়ে নিল।
এ যুবক ছিলেন যুবায়ের। দর্শকগণ অগ্রসর হয়ে সালিহের বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে ও তাঁর হস্ত মর্দন করতে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ভীড় জমাল। সালিহ ক্রোধ ও লজ্জায় ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

ওলীদ দাঁড়িয়ে অগ্রসর হলেন। যুবায়েরের হস্ত মর্দন করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। তারপর সালিহের দিকে তাকিয়ে বললেন–সালিহ, তুমি ক্রন্দ না হলে হয়ত পরাজিত হতে না। তা সত্ত্বেও এ যুবকের ন্যায় তোমাকেও আমি পুরস্কারের যোগ্য মনে করি।

সর্বশেষে বল্লম নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা শুরু হল। প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর আটজন শ্রেষ্ঠ বল্লমধারী নির্জবাচিত হল এবং শেষ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। প্রতিযোগীদের সংখ্যা যতই কমে আসল দর্শকদের উৎসাহ উত্তেজনা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে একদিকে একজন এবং অপর দিকে দু'জন বল্লমধারী মাত্র রয়ে গেল। একক বল্লমধারী অপরাপর তার উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমিসাৎ করে স্বীয় শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। দর্শকগণ তাঁকে চিনতে পেরে প্রশংসা ও অভিনন্দনের গগন–বিদারী কলরোল উত্থাপন করল। এ যুবক ছিল এক গ্রীক নও মুসলিম। তার নাম আইয়ুব। আইয়ুব বিজয়ীভাবে বর্শা উঁচিয়ে আখড়ার চারদিকে ঘুরে আবার ময়দানে এসে দাঁড়াল।

ঘোষক হাঁক দিল–এ যুবকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় এমন কেউ আছে?

দর্শককের দৃষ্টি সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিকের উপর নিবন্ধ। সুলায়মান শিরস্ত্রাণ পরিধান করে তাঁর পার্শ্বে দন্ডায়মান একটি সুন্দর গাঢ় বাদামী রঙের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। সূর্যালোকে তাঁর বর্ম ঝক্‌ঝক্ করছিল। মৃদু বাতাসে তাঁর গ্রীক প্রতিদ্বন্দ্বীকে শিরস্ত্রাণের উপর সবুজ রেশমের গুচ্ছ আন্দোলিত হচ্ছিল।

সুলায়মান ও আইয়ুব পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। দর্শকগণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে সালিসের পতাকার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিল। সালিস সংকেত দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। বিদ্যুৎগতি অশ্ব পরস্পরের দিকে ধাবিত হল। আরোহীরা পরস্পরের নিকট পৌঁছে আত্মরক্ষা করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে প্রস্তুত হলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেয়ার আগে সুলায়মান প্রতিপক্ষের সমস্ত দৰতা পর্যবেক্ষণ করে আত্মরক্ষার উপায় ভেবে রেখেছিলেন। কাজেই আয়ুবের আক্রমণ ব্যর্থ হল এবং সুলায়মানের বল্লম আইয়ুবের শিরস্ত্রাণের উপর এক প্রচন্ড আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করল।

সালিস সুলায়মানকে বিজয়ী ঘোষণা করল। ওলীদ উঠে ভ্রাতাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আইয়ুবকে উৎসাহ দিলেন।

সুলায়মান শিরস্ত্রাণ নামিয়ে বিজয়ী বেশে দর্শকদের দিকে তাকালেন এবং প্রথামত আখড়ার চতুর্দিকে পরিক্রম করে আবার ময়দানে এসে দাঁড়ালেন।

তিন

ঘোষক তিনবার হেঁকে বলল– এমন কেউ আছে, যে সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিকের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহসী? দর্শকগণ আগেই জানত এবার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। তারা আমীরুল মু'মেনীনের আসন ত্যাগের অপেক্ষা করছিল মাত্র। কিন্তু যখন এক শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে জনৈক আরোহী বল্লম হাতে ময়দানে এসে দাঁড়াল, তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সুলায়মান ইবন্ আব্দিল মালিকের সাথে এক বল্লমধারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অগ্রসর হয়েছে, দর্শকদের বিস্ময় সেজন্য ছিল না; বরং তারা এ কারণে বিস্মিত হয়েছিল এ অপরিচিত অশ্বারোহীর শরীরে না ছিল বর্ম, না ছিল চর্তুমুখী ঢাল। তার পরিধানে ছিল কালো রংগের আটা পোশাক। মাথায় শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে ছিল শ্বেত পাগড়ী এবং চক্ষু ছাড়া বাকী চেহারা কালো পর্দায় ঢাকা ছিল।

এরূপ প্রতিযোগিতায় শুধু তারাই বর্ম ছাড়া যোগ দেয়, যারা প্রতিপক্ষের হীনতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী। কিন্তু সুলায়মান ছিলেন সেদিনকার বিজয়ী বীর। তাঁর বিরুদ্ধে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যতীত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর অশ্বারোহীর বীরত্ব দেখে প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান হয়েছিল।

ওলীদ ও যুবায়র ছাড়া আর কেউ জানেতন না এ বীর কে। কিন্তু তাঁর এরূপ অসম সাহস দেখে ওলীদও বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি যুবায়রের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন–এ মুহম্মদ ইবন্ কাসিম, না অন্য কেউ?

যুবায়র উত্তর দিলেন– সেই বটে।

কিন্তু সে সুলায়মানকে কী মনে করে? তার পঞ্জর যদি লৌহ নির্মিত না হয়ে থাকে, তাহলে আমার ভয় হয় কাঠের ভোঁতা ফলকও তার পক্ষে বল্লমের তীক্ষ্ম অগ্রভাগের চেয়ে কম বিপজ্জনক প্রমাণিত হবে না। তুমি যাও তাকে বুঝিয়ে বল।

যুবায়র বলেন– আমীরুল মু'মেনীন, আমি তাকে বুঝিয়েছি। সে নিজেও এ বিপদ সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সে বলে এ অবস্থায় সে যদি জয়লাভ করতে পারে তবে যুবকদের উপর উত্তম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

সিন্ধুর অবস্থা বলে তাদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। বর্ম ছাড়া অশ্বারোহী অধিকতর কর্মতৎপর থাকে, এটাও তার মত।

যুবায়রের উত্তরে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি উঠে নিজেই মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের দিকে অগ্রসর হলেন। দর্শকগণও অতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল।

মুহাম্মদ ইবন্ কাসিম সুলায়মানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওলীদ কাছে পৌঁছে তাঁকে ডেকে বললেন– বৎস, আমি তোমার বীরত্ব স্বীকার করি। কিন্তু এটা বীরত্ব নয়, নির্বুদ্ধিতা। তুমি বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ছাড়াই আরবের শ্রেষ্ঠ বল্লমধারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে। তিনি যদি এটাকে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা বলে মনে করেন, তবে আমার ভয় হয় তুমি দ্বিতীয়বার ঘোড়ায় চড়ার উপযোগী থাকবে না।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম বললেন– আমীরুল মু'মেনীন, আল্লাহই জানেন আত্মম্ভরিতা আমার উদ্দেশ্যে নয়। এক সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছি। তাছাড়া এটা খুব বিপদও নয়। আমার মনে হয় বর্ম পরে অশ্বারোহী খুব চটপটে থাকে না।

কিন্তু তোমার তৎপরতা যদি তোমার পঞ্জর রক্ষা করতে না পারে?

তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না। আমার অস্থির পঞ্জরের চেয়ে আমি সেই বালিকার জীবন বেশী মূল্যবান মনে করি, যার বুকে আমাদের নিষ্ঠুর শত্রুর শর দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তার সাহায্য করা যদি আল্লাহর উপহাসের পাত্র হতে দেবেন না। সম্ভবতঃ আমি জয়লাভ করার পর এই লোকারণ্যে তার বাণী পাঠ করে শুনাতে পারব। ব্যক্তিগত প্রচারের দ্বারা যে কাজ অনেক মাসে সম্ভব হবে না, তা আজ কয়েক মুহূর্তে সম্পন্ন হবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন এবং দু'আ করুন– যেন আল্লাহ আমার সহায় হোন।

ওলীদ বললেন–তুমি অন্ততঃ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে নিতে?

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম জবাব দিলেন– আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু যে যোদ্ধা বল্লমের আক্রমণ মস্তক দ্বারা রোধ করে, তাকে আমি কৃপার পাত্র মনে করি। আমার মাথার নিরাপত্তার জন্য পাগড়িই যথেষ্ট।

ওলীদ বললেন–বৎস, আজ যদি তুমি সুলায়মানকে হারাতে পার তবে ইন্‌শাআল্লাহ্ সিন্ধুর হানাদার বাহিনীর পতাকা তোমার হাতেই ন্যস্ত হবে।

ওলীদ ফিরে চললেন। ঘোষককে কি কথা বলে আসন গ্রহণ করলেন।

অন্যদিকে সুলায়ানের কাছে কয়েকজন দর্শক দাঁড়িয়েছিল। সালিহ অগ্রসর হয়ে সুলায়মানকে বলল– আমীরুল মু'মেনীন আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। আপনি সতর্ক থাকবেন।

সুলায়মান জিজ্ঞেস করলেন–কিন্তু এ উন্মাদটি কে?

আমি জানি না। কিন্তু সে যে–ই হোক আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আর ঘোড়ায় চড়বে না।

ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে বলল– উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, এখন সুলায়মান ইবন্ আব্‌দিল মালিক এবং মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের প্রতিযোগিতা হবে। কালো পরিচ্ছদধারী তরুণের বয়স সতর বৎসরের কম।

দর্শকবৃন্দ অধিকতর মচৎকৃত হয়ে কালো বেশধারী অশ্বারোহীর দিকে তাকাতে লাগল। সালিস সংকেত করার সাথে সাথেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ণ বেগে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। দশকবৃন্দ বিশ্বভুবন নির্বান বিস্ময়ে চেয়ে রইল। উভয় অশ্বারোহী প্রতিপক্ষের আক্রমণ এড়িয়ে চলে গেলেন। জনসাধারণ তুমুল ধ্বনি তুলল।

তরুণ ও যুবক সম্প্রদায় বহুক্ষণ পর্যন্ত মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের প্রশংসাসূচক জয়ধ্বনি করে গেল। বয়স্করা বলতে লাগলেন, এ বালক অত্যন্ত দক্ষ ও তৎপর বটে, কিন্তু সুলায়মান ইবন্ আব্‌দিল মালিকের সাথে এর প্রতিযোগিতা জেনে–শুনেই ওর খাতির করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সে বেঁচে যায় সে হবে এক মু'জিয়া। কোথায় সতর বছরের অপোড়ন্ড, আর কোথায় সুলায়মানের মত অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

যুব–সম্প্রদায় কিন্তু আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। সুলায়মানের পরিবর্তে এ সতর বছরের বিদেশীই এখন তাদের একমাত্র বীর নায়কে পরিণত হয়েছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে দিতে নারাজ। দর্শকদের তর্ক কোথাও হাতাহাতিতে পরিণত হল।

প্রথমত বল্লমধারীদের আর এক সুযোগ দেয়া হল। উভয়ে আবার প্রতিপক্ষরূপে দন্ডায়মান হলেন। বালক ও যুবক–সম্প্রদায় দৌড়ে সেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে ছিলেন তাদের আদর্শ বীর। সকলের দৃষ্টি সে কাপড়ে ঢাকা মুখখানি দেখার জন্য উৎসুক হয়েছিল। সালিস দর্শকদের ঠেলে পেছনে হটিয়ে দিল এবং স্বস্থানে ফিরে দাঁড়াল। সংকেতের পরেই দর্শকগণ আর একবার ময়দানে ধূলি উড়তে দেখতে পেল। মুহূর্তের জন্য আবার পূর্ণ নীরবতা ফিরে এল।

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম আবার হঠাৎ একদিকে ঝুঁকে সুলায়মানের বল্লমের আঘাত থেকে বেঁচে গেলেন। সুলায়মানও বামদিকে ঝুঁকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততোধিক তড়িৎগতিতে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম তাঁর বল্লমের গতি মুখ বদলে দিলেন যাতে সুলায়মানের দক্ষিণ পঞ্জরে আঘাত লেগে তাঁকে আরো বামে ঠেলে দিল। সুলায়মান ভারসাম্য হারিয়ে নীচে পড়ে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালেন। অস্থি–পঞ্জরে হাত রেখে তিনি অত্যন্ত অসহায়ভাবে এদিক–ওদিক তাকাতে লাগলেন।

চতুর্দিক থেকে গগণ–বিদারী তুমুল জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। কিছুদুর গিয়ে মুহম্মদ ইবন্ কাসিম অশ্বের মোড় ঘুরিয়ে সুলায়মানের কাছে এসে অবতরণ করলেন। তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর প্রসারিত হস্ত গ্রহণ না করেই সুলায়মান দ্রুতবেগে একদিকে চম্পট দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার দর্শক মুহম্মদ ইবন্ কাসিমের চারদিকে জড় হল। গ্রীক অশ্বরোহী আইয়ুব অগ্রসর হয়ে মুহম্মদ ইব্ন কাসিমের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম তুলে নিল এবং বলল–আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আপনার মুখ থেকে পরদা সরিয়ে নিন। আমরা সবাই আপনার চেহারা দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

চার

মুহম্মদ ইবন্ কাসিম পরদা খুলে ফেললেন। তরুণ অশ্বারোহীর চেহারা দর্শকদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী তেজোব্যঞ্জক ও গম্ভীর ছিল। তাঁর সুন্দর কালো নয়ন থেকে ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে পবিত্রতা ঠিকরে পড়ছিল। লোকের জয়ধ্বনি ও আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি ----------(চলবে)

হিগস বোসন ও আল কোরআন

আল কুরআনের যদি কোন নিখুত বৈশিষ্ট থেকে থাকে সেটি হল তার অপরুপ প্রকাশ ভঙ্গি এবং অদ্বিতীয় বর্ণনাশৈলী। বিষয় বস্তুর পারিপাট্যে এবং ভারের গাম্ভির্যে কোরআন অন্যান্য সকল ঐশী গ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুত এটি একটি ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও ব্যাক্তি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে বিশ্বকে তাক লাগিয়েছে। ইতিমধ্যে আপনা Big Bang সম্পর্কে অবগত আছেন। এক সময় কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা। যখন সময় গড়িয়ে 10^{-43} Second তখন এক বিপুল শক্তি বস্তুভর অতিশয় সংকুচিত অবস্থা থেকে বিস্ফোরিত হয়ে আদি মহা বিশ্বের সৃষ্টি করে। সুতরাং মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল ১০ বিলিয়ন গুণ তার বিলয়ন গুণ তার বিলিয়ন গুণ তার বিলিয়ন গুণ তার বিলিয়ন গুণ ১ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তার সমান সময় লেগেছিল। আপনার জ্ঞান ও কল্পনার অতীত এত অসীম ক্ষুদ্র সময় মহা বিশ্ব জন্মেছিল। মহাবিশ্ব জন্মের পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন কোথা থেকে কত শক্তির উৎপন্ন হল? যার ফলে অসীম ক্ষুদে সময় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হল। বিজ্ঞানের সকল দ্বন্দ্বিকতা বিপুল পরিমাণ রাগ ভৈরব এখানে এসে মুখ থুবরে পড়েছে। এই হতাশ কণ্ঠের সাথে কন্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা হয় হায় তারা যদি কুরআনের দিকে চোখ বুলাত। কত সুন্দর জবাব না কুরআনে আছে।

বিংশ শতাব্দী থেকে এক বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মহা বিস্ফোরণ সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করেছে আর ১৪০০ বছর পূর্বের আল–কুরআন কী ব্যাখ্যা করেছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করব।

আগেই বলে রাখা ভাল বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে কল্পিত, অপ্রমাণিত আইন বা নীতির উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের দৃষ্টি। এর বিপরীতে আমরা জানি কুরআন–সত্য আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে আমরা জানি $E=mc^2$ 1kgভরের কি পরিমাণ শক্তি আছে এই কমীকরণ থেকে বের করা যায়।

শক্তি 1kgভর × আলোর বেগের বর্গ

$E= 1kg \times (3\times10^8)^2\ ms^{-1}$

$= 9\times10^{16}\ kg\ ms^{-2}\ .s$

$= 9\times10\times^{16}$ mas

= 9×1016Joules

= 10×17 Joules

অর্থাৎ 9×10^{10} Joules পরিমাণ শক্তিকে ঘনায়ন করলে কেবল 1kg পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব। সেহেতু অসীম শক্তির উৎস থেকে কল্পনাতীত পরিমাণ শক্তিকে ঘনায়ন করলে একদম শূন্য অবস্থায় বস্তুকে রাখা সম্ভব।

Sourced of Energy 10^{17} Joule $\rightarrow \frac{E}{C^2}$ (Mkg) (eq^n…… (i)

ইচ্ছা করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পদার্থ এবং শক্তি দুটো ভিন্ন জিনিস।

জনাব আইনস্টাইন সাহেব প্রমাণ করলেন পদার্থ এবং শক্তি হচ্ছে এপিঠ ওপিঠ। পদার্থের নিত্যতার সূত্র এবং শক্তির নিত্যতার সূত্র যে নিছক কোন সূত্র ছিলনা মানুষ সে সম্পর্কে সচেতন হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পারমানবিক বোমার বিস্ফোরনে।

$$_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}^{92}Kr + {}^{141}Ba + 3{}_1^1n + \text{Higher Energy}$$

উপরে দেখা যায় ইউরোনিয়াম এর বিভাজনে ক্রিপটন এবং বেড়িলিয়াম উৎপন্ন হয় এবং কিছু পরিমাণ ভর কমে যায়। এই অদৃশ্য ভরই শক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। সূর্যের বিপুল শক্তির ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে মাত্র। সূর্যের প্রতি সেকেন্ডে ৬ মিলিয়ন টন H He হয় এবং ৪ মিলিয়ন H অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অদৃশ্য ভরের উৎপন্ন শক্তি ভাসিয়ে রাখে সমগ্র দুনিয়া।

বস্তুর ভর এই ব্রহ্মান্ডে প্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কণার ভর না থাকলে তা ছোটে আলোর বেগে জোট বাধে না কারো সাথে। অথবা এই ব্রহ্মান্ড জুড়ে বস্তুর পাহাড়, গ্যালক্সি গ্রহ–নক্ষত্র। পৃথিবী নামক গ্রহে আবার নদী–নালা গাছপালা এবং মানষ সবই বস্তু। কনার ভর না থাকলে থাকে না এসব কিছুই। পদার্থের ভর অনেক কিছুর সঙ্গে মানুষের ও অস্তিত্বের মূলে। ভর রহস্যের সমাধান মানে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা। এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে যে কণা তার নাম হিগস বোসন। এহেন কণার খোঁজে সার্ণ গবেষণাগারের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে চার বছর ধরে চলছে খোঁজ। সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে আলোর বেগে ধাবমান বিপরীত মুখী প্রটন কণা। মুখোমুখি সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা। আর সংঘর্ষের বিপুল এনার্জি থেকে আলবাট আইনস্টাইন আবিস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কোটি কোটি কণা। যারা আবার জন্মের পর কয়েক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংস হয়ে জন্ম দিয়েছে নতুন কণার। বিজ্ঞানের হিসাব বলছে প্রটন প্রটন সংঘর্ষের এনার্জি থেকে জন্মাবে পদার্থের ভর ব্যাখ্যা দানকারী হিগস বোসন। যারা জন্মেই ধবংস হয়ে যাবে নতুন কণার জন্ম দিয়ে। প্রটন–প্রটন সংঘর্ষ ঘটেছে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার এর অ্যাটলাস এবং সি এম এস নামে দুই যন্ত্রে। সেখানে ধ্বংসস্তুপ বিশ্লেষণ করে হিগস কণার খোজ নিয়েছেন ওই দুই যন্ত্রের সাথে যুক্ত দু দল বিজ্ঞানী। স্পষ্ট জানা গেল নতুন কণার চিহ্ন। যে কণার ভর 133 proton এর সমান। eq^n……(ii)

উপরিক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যয় শক্তি হতে পদার্থ সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা বহন করে।

শূন্য সময় বস্তু ও শক্তির অস্তিত্ব শূন্য ধরে নেওয়া হয় আর এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি মহাবিশ্বের আদি পদার্থ সম্পূর্ণ শূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের মেনে নিতে হবে বিপুল শক্তি থেকেই এটা সম্ভব হয়েছে। কি এই বিপুল শক্তি? কোথা থেকে এল বিপুল শক্তি? আমরা $E=mc^2$ সম্পর্কে জানি $E=mc^2$ হওয়া সম্ভব নয় যদি না এর পিছনে শক্তি আনা সম্ভব হয় শূন্য থেকে বস্তু সৃষ্টি হয়েছে এই ধারনায় পৌঁছতে হলে যে ব্যাখ্যা হীনতার সৃষ্টি হয় সেই ব্যাখ্যাহীনতার সমাধান হয় একটি অসীম বহিঃশক্তিতে কল্পনা করলে (তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা)

মনে করি Al-Quran হচ্ছে (Foreing power) তিনি শূন্য বা তৎপূর্ব থেকে বিরাজমান $E=mc^2$ এর চালিকা শক্তি। eq^n.....- (i) এর বিপরীতে eq^n..... (iii)
eq^n..... (iii) কি অনুমান কৃত ধারণা? ফিরে আসুন Al-ছুঁৎহ এর পাতায়" তাহারা কি লক্ষ করেনা কিভাবে আল্লাহ আদিতে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? (29:19), ওহে মানুষ তোমরা তো ইতিমধ্যেই অবগত আছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে 56:62) এছাড়া আরও চোখ বুলাতে পারেন (10:4, 22 64, 29:19, 30:11) পরমাণুর প্রটন ও নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে। বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ বলেন নিউক্লিয়াসের বিভিন্ন কণিকার মধ্যে এক প্রকার আকর্ষণ বল কাজ করে। এখন লক্ষ করুণ 51:47 দিকে। বলেছে আমি বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করেছি শক্তি বলে। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টিই হয়েছে শক্তি বলে। ফিরে যাই eq.....(i) এ বিজ্ঞান যে শক্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয় Al=Quran এই শূন্যতা পূর্ণ করে।
পর্ব–১

C.M. ABDULLAH
American International University Bangladesh
Department of (EEE)

আল কোরআন ও ভ্রুণবিদ্যা

মোঃ আনোয়ার হোসাইন
তায়েরুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ
এম.বি.বি.এস (৫ম বর্ষ)

সূরা হজ্বের ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–---------- আমি তোমাদের মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি এর পর বীর্য থেকে, এর পর জমাট রক্ত থেকে, এর পর পূর্ণাঙ্গ আকৃতি বিশিষ্ট এবং অপূর্ণাঙ্গ আকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যা ইচ্ছা রেখে দেই, এর পর আমি শিশু অবস্থায় বের করি।

সূরা হজ্ব আয়াত–৫

সুপ্রিয় পাঠক কোরআন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হলে সর্বপ্রথম সেই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়। আমি মনে করি সেটি হল ভ্রুণ বিদ্যা তথা Embryology) যেখানে আলোকপাত করা হয় পুংও স্ত্রী কোষ থেকে কিভাবে একটি শিশুতে পরিণত হয়। আমি মনে করি এর একমাত্র উৎস হল মহাপবিত্র আল কোরআন। ভ্রুনবিদ্যা শব্দটি উৎপত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত Relating to origin (qenesis) অন্যভাবে বলা যায় বংশগতি বিদ্যা তথা (Heriditany)
Acurding to world dictionary
The branch of biology that deal's with the transmission and variation (alteration, mutation, diversity, deviation) of mhented characteristices in particular chromosome and DNA. !Professor keith I Moore-Said that, The statement we're about show you are from the HOLY QURAN, and is said to be the official unchanged word of GOD reveald over 1400 year's ago.
(Professor emenitus and clinical
anatomest "American association of Anatomists)
ভ্রণ বিদ্যার উৎস সম্পর্কে উল্লেখ করতে হলে, পবিত্র কোরআন আয়াতগুলো তুলে ধরতে হয়–
সূরা আল মুমিনুন এর ১৩–১৪নং আয়াতে সকল ধাপগুলো উল্লেখ করেন– যেমন
(1) Stuge of Conception. The state of being concived.
(2) Stage of cenbryo
(3) Stage of jectus
এ ছাড়া আরো যেখানে উল্লেখ আছে–
সূরা, ত্বরিক (৬–৭), মুমিনুন–১৩, সাজদাহ ০৮, দাহর–২ যুমার–০৬ সূরা হজ্ব–৫
সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে ভ্রুণবিদ্যা সম্পর্কে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি বরং বলা হয় যে, The only reasonable conchision is taht shese description wheve revicleu to Muhammad (SM) send from GOD.

(Prof. Keith & Moore)

আল্লাহ তা'আলা বলেন–----------

(অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সাংবাদিক আধারে স্থাপন করেছি)

এখানে ------ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হলে– প্রথমে এর স্বার্থ সম্পর্কে জানতে হবে। (অ সরহড়ৎ য়ঁধহঃরঃু ড়ভ ষবমঁরফ) অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ (যা শুক্রাণু ও ডিম্বানু) হিসেবে এই তরল পদার্থের উৎস হল– সূরা আত ত্বরিক এর ৬–৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–---------- সে সৃজিত হয়েছে সবোগ স্থলিত পানি দিয়ে যেটা আসে---------- মেটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে তথা সামনে থাকে বক্ষপাজর এবং পিছনে থাকে মেরুদন্ড। যেটাকে তথা নিষিক্ত এই শক্রাণু ও ডিম্বানু (শুক্রবিন্দু) ২মড়ষব কে স্থান দেওয়া হয়েছে সংরক্ষিত আধারে। তথা ---------- (সংরক্ষিত আধার) ও তথা জরায়ু–(implantation of jertilized ova mto the uterus)

সূরা আল মুমিনুল এর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

Then we made the dirp into a ALAQAH ALAQAH means (Blood clot, suspended, Lecech) And then we changed the ALAQAH into a lamp, Then we made out of that lamp into Bones, And the e clothed the bone with flesh.

Then we caused him to grow and come into being and attain the defineitive form

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা, প্রথমে নিষিক্ত শক্রানু ও ডিম্বানুকে একটি সুরক্ষিত আধারে ধারণ করেছেন এরপর উহাকে জমাট রক্তে রূপ দিয়ে তাকে মাংসপিন্ডে পরিণত করেছেন। এরপর ঐ মাংশপিন্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাংস দ্বারা আবৃত করত নতুন রুপে দাঁড় করিয়েছেন। আর এটাই হল qeneticus রে উৎপত্তি।

ফিরে দেখা ২০১৪

জানুয়ারী:

১- রাষ্ট্রদোহী মামলায় পাকিস্তানের সাবেক সেনাশাসক পারভেজ মোশররফের বিচার কাজ শুরু।

৫- দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪৭ আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

ফেব্রুয়ারী:

৭- লালবাগ কেল্লার ইতিহাস–ঐতিহ্য নিয়ে নির্মিত 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো উদ্বোধন।

১৫- প্রায় ১০ মাসের রাজনৈতিক অচলাবস্থার পর নতুন সরকার ঘোষণা করে লেবানন।

মার্চ:

৮- ২৩৯ জন আরোহী নিয়ে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের গঐ ৩৭০ বিমান কুয়ালালামপুর থেকে বেইজিং যাবার পথে নিখোঁজ।

১০- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন।

এপ্রিল:

১৩- দেশের প্রতি জেলায় শিশু আদালত গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি।

১৫- ইরাকের কুখ্যাত আবু গারিব কারাগার বন্ধের ঘোষণা দেয় দেশটির বিচার মন্ত্রণালয়।

মে:

১- ব্রুনাইয়ে শরিয়াহ আইন চালু।

১৫- মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদীতে তিন শতাধিক যাত্রী নিয়ে জাহাজ ডুবি।

জুন:

২- ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ও ফাতাহ আন্দোলনকে নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐকমত্যের সরকার শপথ গ্রহণ করে।

২১- নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দেশের ২৬তম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা ও পরীক্ষামূলক উদ্বোধন।

জুলাই:

৭- ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করে নেদারল্যান্ডসহ রাজধানী দি হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সর্বশ্লিষ্ট আদালত।

৮- ঙঢ়বৎধঃরড়হ চষড়ঃবপরঃরাব ঊফমব নামের সাংকেতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে গাজায় নির্বিচার বিমান হামলা শুরব করে ইসরাইল।

আগস্ট:

৪- দুই শতাধিক যাত্রী নিয়ে এমভি পিনাক–৬ নামের একটি লঞ্চ মাওয়ার কাছে পদ্মায় ডুবে যায়।

৯- মিশরের নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামপন্থী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড সমর্থিত রাজনৈতিক দল ফ্রিডম এ্যান্ড জাস্টিস পার্টিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন দেশটির একটি আদালত।

সেপ্টেম্বর:

৮- ইরাকে প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদির নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ঐকমত্যের সরকার অনুমোদন করে দেশটির পার্লামেন্ট।

১৭- বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপিত।

অক্টোবর:

১১- নৌবাহিনীর প্রথম মিসাইল ফ্রিগেট 'বানৌজা ওসমানকে' ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড প্রদান।

২৩- ইসরায়েলের পাশে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষে ভোট দেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের সদস্যরা।

নভেম্বর:

১- স্মরণকালের ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কবলে পড়ে দেশ।

২৩- ইসরাইলের মন্ত্রিসভায় বিতর্কিত 'ইহুদি রাষ্ট্র' বিল অনুমোদিত।

ডিসেম্বর:

২- স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে ভোট দেয় ফরাসি পার্লামেন্ট।

৯- দেশে প্রথমবারের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর ১৫ দিনব্যাপী জরিপ শুরু।